KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007

Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩

Collection : KLMLGK

Publisher মীর রহমান

Title চতুরঙ্গ

Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.

Vol. & Number ৪৭/৭
৪৭/৮
৪৭/৯
৪৭/১১
৪৭/১২

Year of Publication Nov 1986
Dec 1986
Jan 1987
March 1987
April 1987

Condition : Brittle : Good ✓

Editor : আবদুর রাউফ

Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

মার্চ
১৯৮৭

অর্থনীতিতে 'অমর্ত্য সেন বা সুখময় চক্রবর্তী যে স্তরের কাজ করেছেন সেটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে সম্ভব হত না।' কী কারণে? অর্থনীতিতে সদর্থক মৌলিক গবেষণা করতে হলে কেমন পরিমণ্ডল প্রয়োজন? তেমন পরিমণ্ডল পশ্চিমবঙ্গে কোথাও আছে কি? এই প্রসঙ্গ নিয়ে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত-র প্রবন্ধ "পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতি-গবেষণা"।

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর তাঁর বিখ্যাত রচনা "বনলতা সেন" নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে চলেছেন তাঁরই সমসাময়িক স্বভাষী কবিরা : ওই কবিতার রূপকল্পগুলিতে নাকি পূর্ববর্তী কোনো বিদেশী কবিতার স্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে। বিতর্ক-জাগানো "বনলতা ও হেলেন" নিবন্ধে শ্রীকান্ত রায় এই অভিযোগ খণ্ডন করে জীবনানন্দের কবিচারিত্র্যের মূল ভারতীয় উৎস সন্ধান করতে চেয়েছেন।

উরদু সাহিত্যের শক্তিমান এবং বিতর্কিত গল্পকার হিসেবে সাদাৎ হোসেন মণ্টোর নাম ভারতে পাকিস্তানে সুপরিচিত। মণ্টো ছিলেন বঞ্চিত-নিগৃহীত-অবহেলিত মানুষের কথাকার। সনাতনীদের ভ্রুকুটি আর রাজরোষ উপেক্ষা করে তাঁর লেখনী সমাজের কুৎসিত দিকগুলিকে দ্বিধাহীনভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে। কিরণশঙ্কর মৈত্রের কলমে মণ্টো-সাহিত্যের মূল্যায়ন : "মণ্টো : তিক্ত, বিষণ্ণ ভালোবাসা"।

বিহার বাংলা আকাদেমি সম্বন্ধে শঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন।

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

বর্ষ ৪৭। সংখ্যা ১১
মার্চ ১৯৮৭
ফাল্গুন ১৩৯৩

পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতি-গবেষণা ভবতোষ দত্ত ৮৩৫
মণ্টো : তিক্ত, বিষণ্ণ ভালোবাসা কিরণশঙ্কর মৈত্র ৮৬০
বনলতা ও হেলেন শ্রীকান্ত রায় ৮৮৭

সঞ্চয় প্রভাতকুমার মিশ্র ৮৪৩
স্বাগতম্ শেখ মহরম আলি ৮৪৪
উৎসমুখ উজ্জ্বল সিংহ ৮৪৫
গাছের আগায় নয় অভিজিৎ সেনগুপ্ত ৮৪৬

যেখানে উত্তাপ আছে কামাল হোসেন ৮৪৭
অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৮৭৪

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ৯০১
রঘুপতি-চরিত্র : একটি ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণ অঞ্জনা গুহ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থসমালোচনা ৯০৬
কৃষ্ণ ধর, সুনীল সেন, কমলেন্দু ধর, পূরবী রায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, কামাল হোসেন

চিত্রকলা ৯২০
সর্বভারতীয় বাৎসরিক প্রদর্শনী প্রসঙ্গে কলারসিক

প্রতিবেদন ৯২২
বিহার বাংলা আকাদেমি শঙ্কর ভট্টাচার্য

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

The Pelican-History of Arts

J. C. HARLE

THE ART AND ARCHITECTURE OF THE INDIAN SUBCONTINENT

James Harle is Keeper of Eastern Art at the Ashmolean Museum and a Student (Fellow) of Christ Church, Oxford. He also lectures for the Oriental Studies faculty of the university on the Indian art and architecture. His interest is *Indian Arts.* The present work, the product of many year's research, attempts to give as complete an account as possible within the compass of one volume of the glories of India's three-millennia-old artistic and architectural heritage.

£9.95=Rs. 297.00

RITWIK GHATAK

CINEMA AND I

This book is a representative volume of RITWIK GHATAK'S writings on cinema. In addition to the text the book offers an exhaustive filmography, production stills, and details of his involvement with IPTA, as well as a list of his written works.

Rs. 46.00

HENRY YULF AND A. C. BURNELL

EDITED BY WM. CROOKE

HOBSON-JOBSON

A Glossary of colloquial Anglo-Indian Words and Phrases and of Kindred Terms, Etymological, Historical, Geographical, and Discursive.

New edition :

Paperback Rs. 75/- Hardback Rs. 100/-

Rupa & Co.

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700 073

New Releases

Oxford English
The Essential Guide to Grammar, Spelling, Pronunciation, Slang, Vocabulary, Proverbs, Scientific, Medical, Legal and Computer terms Rs. 175

R. McCRUM, W. CRAN & R. MACNEIL
The Story of English Rs. 190

T. S. KANE
The Oxford Guide to Writing
A Rhetoric and Handbook for College Students $ 15·95

R. DeMARIA, *Jr*
Johnson's Dictionary and the Language of Learning £ 20·00

D. J. ENRIGHT, *Ed.*
Fair of Speech
(Paperback) £ 4.95

D. J. ENRIGHT
The Alluring Problem
An Essay on Irony £ 12.95

HANIF KUREISHI
My Beautiful Laundrette *and* **The Rainbow Sing** £ 3.95

Oxford University Press
Faraday House
P-17 Mission Row Extension
Calcutta-700 013

পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতি-গবেষণা

ভবতোষ দত্ত

সারা ভারতের অর্থনীতি-গবেষণার পথে প্রথম পদক্ষেপ করেন রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) তাঁর দুই খণ্ডে রচিত "ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস" দিয়ে। দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০২ এবং ১৯০৪-এ। সিভিল সারভিসে যোগদানের প্রারম্ভেই রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় কৃষকদের সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন। তাতে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ছিল, কিন্তু এটিকে গবেষণা-গ্রন্থ বলা যায় না। আরো অনেক আগে, ১৮৩৩-এ, রাজা রামমোহন রায় বিলাতের পারলামেনটের কমিটির প্রশ্নের যেসব উত্তর দিয়েছিলেন তাতেও বিশ্লেষণ ছিল, কিন্তু গবেষণা ছিল না। সারা ভারতে অর্থনীতি-চর্চার পথিকৃৎ রাজা রামমোহন, কিন্তু অর্থনীতি-গবেষণার পথিকৃৎ রমেশচন্দ্র। যে যুগে রমেশচন্দ্র তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই দুটি লেখেন, সে যুগে আমাদের দেশে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে অর্থনীতি পঠন-পাঠনের কোনো পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল না। যাঁরা ইতিহাস পড়তেন তাঁদের কিছুটা অর্থনীতি পড়তে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে অর্থনীতি পড়ানোর সূত্রপাত করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ভারতে প্রথম। ১৯০৯ সালে প্রথম অর্থনীতিতে অনা(র্)স পরীক্ষা নেওয়া হয়, আর ১৯১১তে প্রথম এম. এ. পরীক্ষা হয় সে বিষয়ে।

উনিশ শতকে যেসব বাঙালি অর্থনৈতিক বিষয়ে লিখেছিলেন—যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এঁরা কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ তো কলেজে পড়েন-ই নি, রমেশচন্দ্র দত্তও প্রেসিডেনসি কলেজে মাত্র 'ফার্সট- আর্টস' (পরবর্তী যুগের আই. এ.) পর্যন্ত পড়েছিলেন। আরো পরে বিনয়কুমার সরকার অর্থনীতিতে গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং গভীর অনুশীলন করেছিলেন, কিন্তু তিনি ছাত্র ছিলেন ইতিহাস আর ইংরেজির। এঁরা সবাই অর্থনীতির চর্চায় আর গবেষণায় প্রধানত স্বয়ং-শিক্ষিত। ১৯০৯-এর পর থেকে কয়েকটি কলেজে অর্থনীতির বি. এ. অনা(র্)স ও এম. এ. পাঠক্রমের ব্যবস্থা হয় (বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনও নিজস্ব কোনো অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল না), এবং তার পর থেকেই গবেষণার পথও উন্মুক্ত হয়। খুবই আশ্চর্য হয়ে স্মরণ করতে হয় যে, ১৯১১তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম অর্থনীতির এম. এ. পরীক্ষা নেওয়া হল এবং সে বছরেই এই বিষয়ে একজন অর্থনীতিতে পিএইচ. ডি. পেয়েছিলেন। এই ডকটর যজ্ঞেশ্বর ঘোষ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অর্থনীতির পিএইচ. ডি.। তাঁর নিবন্ধের নাম ছিল

"ইংল্যানড, ফ্রানস, জারমানি ও রাশিয়াতে ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাস এবং কৃষি-সমস্যা"। নিবন্ধটি এখন আর পাওয়া যায় না। বহুদিন পরে—১৯২৪ সালে—যজ্ঞেশ্বর ঘোষ "ইংলিশ থিয়োরিজ অভ রেন্ট্" নামে একটি বই প্রকাশ করেন, কিন্তু সেটি কতটা তাঁর ডকটরেটের নিবন্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা বলা শক্ত। যজ্ঞেশ্বর ঘোষ পরে আর অর্থনীতি-চর্চা করেন নি, কিন্তু তিনি পথ খুলে দিয়েছিলেন।

এই পথ ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির গবেষণা করে ডিগ্রী পান বেশ কয়েকজন—রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বসু, যোগীশচন্দ্র সিংহ, হরিশচন্দ্র সিংহ, রোহিণীমোহন চৌধুরী, সরোজকুমার বসু এবং আরো অনেকে। কুড়ির দশক থেকেই আর-একটা প্রবণতা দেখা দেয়—অর্থনীতির উঁচুদরের ছাত্ররা এখান থেকে এম. এ. পাশ করে বিদেশে চলে যেতে আরম্ভ করলেন গবেষণার জন্য। এঁরা প্রধানত যেতেন লনডন স্কুল অভ ইকনমিকসে—সেখান থেকে কুড়ি আর ত্রিশের দশকে অনেক প্রতিভাবান বাঙালি অর্থনীতিবিদ পিএইচ. ডি বা ডি. এসসি ডিগ্রী নিয়ে এসেছিলেন—যেমন হীরেন্দ্রলাল দে, পরিমল রায়, অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, নলিনাক্ষ সান্যাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী দেওয়া হত, কিন্তু গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বই-পত্রিকা-রিপোর্ট এবং গবেষণার আবহাওয়া কিছুই ছিল না। মাসিক ৭৫ টাকার একটিমাত্র গবেষণাবৃত্তি ছিল, সেটি একবার কেউ পেলে কয়েক বছর আঁকড়ে রাখতেন, নিজেরাও কিছু করতেন না, অন্যদেরও বঞ্চিত করতেন। এর মধ্যেও যাঁরা গবেষণা করেছিলেন, তাঁরা সবটাই করেছেন নিজেদের একক চেষ্টায়—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো সাহায্য পান নি।

এ অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হল চল্লিশের দশকে। ততদিনে বি. এ. এবং এম. এ. ক্লাসের অর্থনীতির পাঠক্রমও অনেকটা আধুনিক করা হয়েছে। এর আগে আমাদের একটা মার্শাল-ভিত্তিক পাঠক্রম ছিল অর্থনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে, কিন্তু ছাত্ররা যখন ভারতের আর্থিক সমস্যা পড়তেন তখন মার্শালীয় অর্থনীতি দিয়ে তার ব্যাখ্যা করতে পারতেন না। বিদেশে অর্থনীতির তাত্ত্বিক দিকটাতে একটা যুগান্তর এসেছিল ত্রিশের দশকে—তার প্রভাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে পড়তে প্রায় দশ বছর লেগে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতের আর্থিক উন্নয়ন সম্বন্ধে গভীর চিন্তাভাবনার প্রয়োজন দেখা দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর গবেষক নতুন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ. ডি.-র বদলে "ডি. ফিল." ডিগ্রীর প্রবর্তন করলেন, যার জন্য প্রয়োজন হত গবেষক ছাত্র হিসাবে কোনো অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে কাজ করা। চল্লিশের দশকের শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে বহু অর্থনীতির ছাত্র ডি. ফিল. ডিগ্রী লাভ করেছেন। স্বাধীনতা-লাভের পরে ক্রমে-ক্রমে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হল—যাদবপুর, বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী—এবং এগুলিতেও ডকটরেটের ব্যবস্থা হল। এঁরা ডিগ্রী দিতেন পিইচ. ডি.। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও পরে ডি. ফিল.-এর নাম বদলে পিএইচ. ডি করল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা উচ্চতর ডকটরেটও আছে—ডি. লিট.। বেশ কয়েকজন সরাসরি এই ডি. লিট. ডিগ্রী পেয়েছেন, আর অন্য কয়েকজন প্রথমে ডি. ফিল. বা পিএইচ. ডি. করে পরে ডি. লিট. ডিগ্রী নিয়েছেন।

একটা কথা এখানেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত। গবেষণার জন্য আত্মিক আকর্ষণে হয়তো অনেকে অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু নতুন-নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পাবার জন্য বা নিযুক্তির উচ্চতর স্তরে উঠবার জন্য একটা গবেষণা ডিগ্রী প্রয়োজন, এই উপলব্ধিতেও আকৃষ্ট হলেন আরো অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকেরাও তাঁদের তত্ত্বাবধানে কত ছাত্র গবেষণা করছে তার তালিকা দিয়ে নিজেদের গুণপনা প্রচার করতেন। অবস্থাটা এমন হল যে এক-একজন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে হয়তো দশ-বারোজন গবেষক ছাত্রের নাম লেখানো আছে। ফলে তত্ত্বাবধান কিছু হয় না, কারণ গবেষক-ছাত্র যদি কাজ করেন তাহলে তাঁর অধ্যাপককেও অনেকটা খাটতে হয়। যত ছাত্র ডকটরেটের জন্য নাম লেখান, আর যত ছাত্র শেষ পর্যন্ত ডিগ্রী পান, তার মধ্যে জন্মায় এক বিরাট ফারাক। এ কথাটা সাধারণভাবে সব বিষয়ের বেলাতেই খাটে, কিন্তু অর্থনীতির গবেষণার ক্ষেত্রে এই ফারাক খুব বেশি প্রকট।

তা ছাড়া আর-একটা বড়ো সমস্যা দেখা দিয়েছে। অর্থনীতির এম. এ. পরীক্ষায় যাঁরা খুব ভালো করে পাশ করেন, তাঁরা হয় সঙ্গে-সঙ্গে কাজ পেয়ে যান অ্যাডমিনিসট্রেটিভ ও অন্যান্য 'সারভিস'-এ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে—আর না হলে বিদেশী বিদ্যালয়ে চলে যান। অনেকে কিছুদিন দেশে অধ্যাপনা করে, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিও পান। তাঁদের অধিকাংশই খুব উঁচু দরের কাজ করেছেন। এটা খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু দুঃখ থেকে যায় যে তরুণ বাঙালি অর্থনীতির ছাত্রদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজগুলি এখানে হয় নি—হয়েছে লনডন, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড, সাসেক্স্, রটারডাম, হার্ভার্ড, রচেস্টার, স্ট্যানফোর্ড, ম্যাসাচুজেটস ইন্সটিট্যুট অভ টেকনলজি ইত্যাদি গবেষণাকেন্দ্রে।

প্রশ্ন ওঠে, দলে-দলে যে অর্থনীতির বাঙালি ছাত্ররা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান (কেউ-কেউ সেখানে থেকেও যান) তা কি কেবলই বিদেশী ডিগ্রীর মোহে? যদি মোহ খানিকটা থাকে তাহলে তারও হেতু আছে, কারণ মুখে যাই বলি না কেন, অধ্যাপনার কাজে নিয়োগের সময়ে আমরা সবাই বিদেশী ডিগ্রীর দাম দিই বেশি। কিন্তু এটাই সব কথা নয়। আরো অনেক কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অর্থনীতিতে উঁচুদরের গবেষণার কাজ করা খুব শক্ত। প্রথমত, গবেষণার জন্য যত বই, গবেষণা-পত্রিকা, সরকারি আর আন্তর্জাতিক রিপোর্ট প্রয়োজন হয় তা কলকাতায় যথেষ্ট এবং সময়মতো পাওয়া যায় না। কলকাতা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির বই আর জারনাল কিনতে যা টাকা ব্যয় করা হয় সেটা খুবই কম। বিশেষত, আজকাল বিদেশী বই এবং পত্রিকার দাম এত বেড়ে গিয়েছে যে বছরে দশ হাজার টাকা খরচ করলেও নতুন প্রকাশনার একটা ছোটো অংশও সংগ্রহ করা যায় না। কলকাতার চেয়ে দিল্লী বা বোমবাইতে তথ্যগত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা বেশি পাওয়া যায়—বোমবাইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আর দিল্লীতে বিভিন্ন মন্ত্রকে আর পরিকল্পনা কমিশনে। কলকাতাতে অবশ্য জাতীয় গ্রন্থাগার আছে কিন্তু সেখানে বই কিনতে দেরি হয় আর কেনার পরে তালিকাভুক্ত হতে আরো দেরি হয়।

এদিক থেকে বিদেশী ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সুবিধা পাওয়া যায় তা আমাদের দেশে অকল্পনীয়। লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় সব বই এবং জারনাল-ই পাওয়া যায়। কোনো বই না পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষকে জানানো মাত্র কিনে আনা হয়। লাইব্রেরিতে বই থাকলে সেটা হাতে আসতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগে না। বইয়ের বিশেষ কোনো অংশ 'জেরকস' ইত্যাদি প্রক্রিয়াতে নকল করে নেবার সুবিধা অনায়াসলভ্য। যাঁদের অনেক তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয় তাঁদের জন্য কমপিউটার সর্বদা প্রস্তুত। লনডনের মতো শহরে লনডন স্কুল অভ ইকনমিকসের লাইব্রেরিতে পৃথিবীর যেখানে ইংরেজি ভাষায় যত বই বার হয় সবই কেনা হয়। অন্য ভাষার বইও প্রচুর। তা ছাড়া আরো অনেক লাইব্রেরি আছে—যেমন চ্যাথাম হাউস—যেখানে গবেষণাকারীদের জন্যই লাইব্রেরি সংগঠিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আলাদা লাইব্রেরি আছে, আর আছে সরকারি মন্ত্রকের লাইব্রেরি। আগে যে সংগ্রহকে ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি বলা হত সেটা অনেক গবেষককে মালমশলা যুগিয়েছে। সর্বোপরি ব্রিটিশ ম্যুজিয়ামের লাইব্রেরি তো আছেই। কেমব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েও বই-পত্রিকার অভাবে

কারো গবেষণা আটকিয়ে আছে, এ নালিশ কখনো শোনা যাবে না।

একথা আমেরিকার ভালো-ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেলাতেও খাটে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে কোনো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নেই, কিন্তু সেখানে আছে বিরাট কংগ্রেস লাইব্রেরি, যেখানে সারা পৃথিবী থেকে বই সংগ্রহ করা হয়। যাঁরা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কাজ করেন তাঁরা বিশেষ সাহায্য পান আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার আর বিশ্বব্যাঙ্কের লাইব্রেরি থেকে। অনেক সময় প্রশ্ন তোলা হয়, ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করবার জন্য ছাত্ররা বিদেশে কেন যান? এ প্রশ্নের একটা উত্তর হল যে ভারত-সম্পর্কীয় তথ্যও একসঙ্গে সাজানো-গোছানো ভাবে বিদেশে যা পাওয়া যায়, ভারতবর্ষে অনেক দৌড়াদৌড়ি এবং কালক্ষেপণ করেও তা পাওয়া যায় না। আর যদি ভারতীয় সমস্যাকে অন্য দেশের সমস্যার সঙ্গে কোনো তুলনীয় পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে দেখতে হয়, তাহলে তার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য এখানে একেবারেই সহজপ্রাপ্য নয়।

আর-একটা অপ্রীতিকর কথা এখানে বলতে হয়। ভারত সরকারের হাতে অনেক অপ্রকাশিত তথ্য থাকে। কোনো ভারতীয় গবেষক যদি সেগুলি পেতে চান তাহলে আমলাতান্ত্রিক কায়দায় তাঁকে বলা হবে যে এগুলি এখনো প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, সে প্রশ্নের উত্তর কেউ দেবেন না। যদি কেউ প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য চান, তাহলে সেটা না-দেওয়ার পক্ষে যুক্তি আছে। কিন্তু কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে সর্বাধুনিক তথ্য কেন গবেষকদের দেওয়া হবে না, তার কোনো কারণ নেই। শুধু প্রকাশিত তথ্যের উপরে নির্ভর করলে গবেষণা বর্তমান কাল পর্যন্ত আসতে পারবে না। এখন ১৯৮৭ সালের প্রারম্ভে ভারতের আন্তর্জাতিক লেনদেনের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে ১৯৮৩-৮৪ সাল এবং ১৯৮৪-৮৫ সালের প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত। কৃষি-উৎপাদনের চূড়ান্ত হিসাব পেতে এক বছর দেরি হয়ে যায়। অথচ হিসাবগুলি সরকারি মন্ত্রকে আছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, যদি কোনো বিদেশী গবেষক ভারতে আসেন এবং দিল্লীর কর্তাব্যক্তিদের কাছে গিয়ে অপ্রকাশিত তথ্য চান, তাহলে তাঁকে সবই দেখানো হয়। স্পষ্ট করেই বোধহয় বলা যায় যে ভারত সরকারের সংগৃহীত অথচ অপ্রকাশিত তথ্য সংগ্রহ করতে হলে গবেষকের ‘শ্বেত-চর্ম’ হতে হবে—কৃষ্ণ-চর্ম ভারতীয়দের প্রতি উপেক্ষা এবং এমন কি রূঢ়তা দেখাতেও কর্তাদের বাধে না। একথা সরকারি ক্ষেত্রের বাইরেও প্রযোজ্য। কয়েক বছর আগে একজন আমেরিকান গবেষক “মাড়োয়ারি”দের উপরে একটি গবেষণাগ্রন্থ লেখেন। অনেক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাঁকে তথ্য দিয়েছিলেন, কিন্তু ভারতীয় জিজ্ঞাসুদের তাঁরা বহুবার বিমুখ করেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতীয় তথ্য সরবরাহে বর্ণ বৈষম্য অনেক বিদেশী গবেষকেরও সকৌতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

তথ্যের পরে আসে গবেষণার তত্ত্বাবধান আর আবহাওয়া। আগেই বলেছি, গবেষণা-ডিগ্রীর জন্য নাম লেখান অনেকে, কিন্তু কাজ করেন না। যাঁদের উপরে তত্ত্বাবধানের ভার তাঁরাও দেখেন না কে কী কাজ করছে। শুধু বৎসরান্তে বিভাগীয় বার্ষিক রিপোর্টে দেখান কত ছাত্র-ছাত্রী তাঁদের কাছে গবেষণায় নিযুক্ত আছে। এটা বিদেশে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে হবার উপায় নেই। কাজ না করলে বিদায় নিতে হবে—এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। তা ছাড়া, আর-একটা বড়ো কথা, অর্থনীতির তাত্ত্বিক দিক বা ‘থিয়োরি’ নিয়ে গবেষণার তত্ত্বাবধান করতে পারেন এমন অধ্যাপক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই কম। যে দু-একজন এখানে তাত্ত্বিক বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কাজ করেছেন। আর ভারতীয় অর্থনীতির ছাত্ররা তাত্ত্বিক গবেষণাতে যেসব নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন, তাঁরা সবাই কাজ করেছেন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের লজ্জার সঙ্গেই স্বীকার করতে হয় যে, অমর্ত্য সেন বা সুখময় চক্রবর্তী যে স্তরের কাজ করেছেন সেটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে সম্ভব হত না।

এই সঙ্গেই পরিমণ্ডলের কথা ওঠে। গবেষণার জন্য অনুকূল পরিমণ্ডল চাই—লাইব্রেরি, পরিসংখ্যানব্যবহারের যান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও চাই এমন একটা আবহাওয়া যেখানে একজনের গবেষণা আর-একজনের গবেষণাকে উৎসাহিত করে এবং এগিয়ে নিয়ে যায়। আমি গবেষক-ছাত্র হিসাবে যদি জানি আর কারা আমার পটভূমিকাতে কাজ করছেন, তাঁদের সঙ্গে যদি সর্বদা আলোচনা করতে পারি—শুধু প্রথাগত ‘সেমিনার’-এ নয়, চায়ের টেবিলে বা অধ্যাপকের ঘরে—তাহলে বুঝতে পারি কোথায় আমার অসম্পূর্ণতা, কোথায় আমার সিদ্ধান্ত দুর্বল। এরকম আলোচনার চেষ্টা আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কোনো-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়েছে, কিন্তু এটা হওয়া উচিত সম্পূর্ণ সহজভাবে, এক গবেষকের সঙ্গে অন্য গবেষকের তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে। আমাদের প্রত্যেক গবেষক এক-একটি আলাদা দ্বীপের মতো—প্রত্যেকেই জলরাশিবেষ্টিত সীমানার মধ্যে আবদ্ধ।

যখন গবেষণা সম্পূর্ণ হয় তখন তার মান যথেষ্ট উঁচু হয়েছে কিনা, তা দেখবেন তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক। আমাদের কয়েকটি নজির আছে যেখানে অধ্যাপক তাঁর ছাত্রের গবেষণা-নিবন্ধের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, কিন্তু বাইরের পরীক্ষকেরা সেটিকে একযোগে বাতিল করেছেন। অবশ্য, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে একটা সমঝোতা থাকে যে তাঁরা পরস্পরের ছাত্রদের ডিগ্রা পাইয়ে দেবেন। দক্ষিণ ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম আছে যে বাইরের পরীক্ষক তাঁর প্রাপ্য টাকা পাবেন গবেষক তাঁর ডিগ্রী পাবার পরে। অর্থাৎ যদি নিবন্ধটিকে বাতিল করা হয় এবং আবার নতুন করে লেখার প্রস্তাবের যোগ্যও মনে না করা হয়, তাহলে পরীক্ষক তাঁর পারিশ্রমিক পাবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়মের মাধ্যমে কী বলতে চান তা খুবই পরিষ্কার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গবেষণা-নিবন্ধ বিদেশী অধ্যাপকদের কাছে পাঠানো হয় মূল্যায়নের জন্য। এতেও নানা সমস্যা আছে—বিদেশী অধ্যাপকদের খুঁজে পাওয়া যায় না, এবং এমন অনেকের কাছে ভারতীয় বিষয়ের নিবন্ধ পাঠানো হয় যাঁরা বিষয়টি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানেন না। কিন্তু ‘সাহেব’-এর মতের মূল্য আমাদের কাছে খুব বেশি, যদিও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আমরা নিরন্তর সোচ্চার। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, ফল প্রকাশে বিলম্ব। নিবন্ধ জমা দেবার পরে দু-তিন বছরেও মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হয় না—গবেষক ডিগ্রীর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে থাকেন। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধ জমা দেবার পরে ফল জানতে তিন-চার সপ্তাহও লাগে না। সেখানে অবশ্য অন্য দেশের পরীক্ষক নিযুক্ত করার কথা ভাবাও হয় না। ভারতে দেড়শ বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি উপযুক্ত এবং সৎ পরীক্ষক না পাওয়া যায় তাহলে সেটা আমাদের কলঙ্ক।

একটা আশার কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে গবেষণাকেন্দ্র গড়ে উঠছে। এরকম কেন্দ্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকদিন ধরেই ছিল। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আগেও কলকাতায় বসুবিজ্ঞানমন্দির বা ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অভ সায়েনস্-এ খুব মূল্যবান গবেষণা হয়েছে। এখন এ ধরনের কেন্দ্র আরো অনেক হয়েছে। অর্থনীতির এবং ব্যাপকভাবে সমাজবিজ্ঞানের উপরে গবেষণাও এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূল্যবান গবেষণার সবচেয়ে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান এখন ‘ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিট্যুট’। পরিসংখ্যানতত্ত্বের বিভিন্ন দিক এবং পরিসংখ্যান ব্যবহারের বিভিন্ন পথ নিয়ে গবেষণা তো হয়ই। তা ছাড়াও হয় পরিকল্পনা, কৃষি-ও ভূমি-ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার মান ও ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি নানা বিষয়ে ব্যাপক এবং গভীর অনুসন্ধান। এখন এখানে ডিগ্রীও দেওয়া হয়—স্নাতক, উত্তর-স্নাতক ও ডকটরেটের পর্যায়ে।

যাঁরা অর্থনীতির ব্যবহারিক দিক নিয়ে পড়াশোনা করতে চান তাঁদের পক্ষে এই ইনসটিট্যুটের চেয়ে ভালো কেন্দ্র ভারতে দুর্লভ। বিগত প্রায় দেড় দশক ধরে অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি উচ্চমানের গবেষণাকেন্দ্র 'সেনটার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েনসেস'। এই কেন্দ্রের প্রধান কাজই গবেষণা এবং গবেষণার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান। এখান থেকে যেসব গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই আন্তর্জাতিক মানে খুব উঁচু স্থানে স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরো দুটি গবেষণাকেন্দ্র আছে। কলকাতার 'ইনডিয়ান ইনসটিট্যুট অভ ম্যানেজমেনট'-এ কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর অর্থনীতির অধ্যাপক আছেন। এঁরা নিজেরা এবং এঁদের ছাত্ররা শিল্পনীতি, মূলধন, শ্রমিকসমস্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে মূল্যবান কাজ করেছেন। খড়গপুরের 'ইনডিয়ান ইনসটিট্যুট অভ টেকনলজি'তেও অর্থনীতি বিভাগ এবং এ বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার মধ্যে থেকেও স্বাধীনভাবে গবেষণার কাজ করে প্রেসিডেনসি কলেজের 'সেনটার ফর অ্যাডভানস স্টাডিজ ইন ইকনমিকস'। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে আলাদা অনুদান পাওয়া যায়। এখানে যাঁরা ছাত্র-গবেষক, তাঁরা এখানকারই অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে ডকটরেট-এর জন্য কাজ করেন—নাম রেজিসট্রি করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গবেষক-ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে খুব নিকট সম্পর্ক থাকাতে এখানে একটা ফলপ্রসূ পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। অধ্যাপকেরা নিজেরাও প্রায় অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছেন—এঁদের কয়েকটি কাজ উন্নয়নসমস্যার গভীরতম অন্তঃস্তলে গিয়ে বিশ্লেষণে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এই সম্পর্কেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত যে ডকটরেটের জন্য গবেষণাকে আমরা গুরুত্ব দিই, কিন্তু সত্যিকারের মূল্যবান গবেষণা যে হয় ডকটরেটের পরে, সেটা আমরা মনে রাখি না। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডকটরেটের কাজে উৎসাহ দেওয়া হয় প্রচুর, কিন্তু সেখানে এটা সর্বজনস্বীকৃত যে ডকটরেট হল গবেষণার কাজে হাতেখড়িমাত্র—কী ভাবে গবেষণা করতে হয় সেটা শিখে নেওয়া। তারপরে আরম্ভ হবে আসল গবেষণা, যেটা হবে ডিগ্রী-নিরপেক্ষ, এবং সে গবেষণা সাধক-অধ্যাপকের সারা জীবন ধরে চলবে। জীবনে একবার মাত্র একটি পিএইচ. ডি. ডিগ্রী করে বাকি জীবন আর কোনো কাজ না করে সেই প্রথম এবং একমাত্র ডিগ্রীর জোরে লেকচারার থেকে রীডার, রীডার থেকে প্রফেসর হচ্ছেন এমন শিক্ষক আমাদের অনেক আছেন। প্রেসিডেনসি কলেজ, স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিট্যুট বা সেনটার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েনসেসের নিরলস সাধনা দেখলে তাই আনন্দ হয়।

অর্থনীতিতে ভালো গবেষণা বাইরে গিয়ে করতে হয়, মাত্র কয়েকটি কেন্দ্র ছাড়া অন্যত্র গবেষণার মান নীচে নেমে যাচ্ছে, গবেষণার পথে বাধাবিঘ্ন প্রচুর—এ সবই সত্যি কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এটাও বোঝা যায় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের মধ্যেই ভালো কাজ করা এবং করানো সহজ হওয়া উচিত ছিল। গবেষণার আগের পর্যায়ে অর্থনীতি অনা(র্)স ও এম. এ.-তে পাঠক্রমের আজকাল অনেক উন্নতি হয়েছে। ত্রিশের দশকেও এখানকার পাশ-করা ছাত্ররা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখতেন যে দেশে তাঁরা যা শিখে এসেছেন সেটাকে ভুলে গিয়ে বিষয়টাকে আবার আদ্যন্ত নতুন করে শিখতে হবে। এখন আর সে-রকমটা হয় না। যাঁরা অর্থনীতি অনা(র্)স পড়েন, তাঁদের এখন দ্বিতীয় বিষয় হিসাবে গণিত অবশ্যপাঠ্য। যাঁরা ভালো মানের ছাত্র তাঁরা এর সঙ্গে তৃতীয় বিষয় হিসাবে নিয়ে থাকেন পরিসংখ্যানতত্ত্ব। এই সহযোগে যেসব ছাত্র তৈরি হয় তাদের পক্ষে আধুনিকতম পন্থায় অর্থনীতির গবেষণা শুরু করতে অসুবিধা হবার কথা নয়। অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষেত্রেই এখন গণিত ও পরিসংখ্যানের প্রয়োজন। 'অর্থমিতি' বা 'ইকনোমেট্রিকস' নামে যে শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তাতে ফাঁক আছে প্রচুর, কিন্তু একে বাদ দিয়ে বাস্তব জীবনের অর্থনীতির গবেষণা প্রায় অচল। যাঁরা এম. এ. পাশ করেন তাঁরা সবাই গবেষণা করবেন এটা আশা করা অন্যায়। কিন্তু যদি পশ্চিমবঙ্গের আটটি বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্বভারতীকে ধরে নিয়ে) থেকে বছরে পনেরো-কুড়িজন কৃতী ছাত্রও গবেষণার ক্ষেত্রে আসেন এবং অধ্যাপক ও ছাত্রের সমবেত প্রচেষ্টায় কাজ অগ্রসর হয়, তাহলে ক্ষোভ থাকে না।

এই সমবেত প্রচেষ্টার কথা বলতে গেলেই আর-একটি বিষয়ের অবতারণা করতে হয়। অনেক সময়ে দেখতে পাই যে আমাদের যেসব ছাত্রকে আমরা খুব উঁচুদরের বলে মনে করি নি, যাঁদের আমরা প্রথম শ্রেণীতে পাশ করার উপযুক্তও মনে করি নি, তাঁরা অনেকে বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উৎকৃষ্ট কাজ করেছেন। আমেরিকার মতো দেশে অবশ্য ভালো-মন্দ সব রকম বিশ্ববিদ্যালয়ই আছে, কিন্তু আমাদের তথাকথিত 'দ্বিতীয় শ্রেণী'র ছাত্ররা সেখানকার সবচেয়ে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও স্বীকৃতি পেয়েছে। এটা আমাদের আত্মসমীক্ষণের প্রয়োজন বুঝিয়ে দেয়। আমরা কি আমাদের ছাত্রদের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে শক্তি আছে সেটাকে টেনে বার করতে পারি না? আমরা কি শুধুই পরীক্ষা পাশের জন্য পড়াই, বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত করি না? এখানেও হয়তো কিছু ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু আমাদের কাছে আমাদেরই পুত্রকন্যারা সুবিচার পায় কিনা সে প্রশ্নের বিচার করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। নানা বাধা-বিঘ্ন-অসুবিধার কথা আগে বলেছি, কিন্তু আমরা যারা অধ্যাপক, তারাই কি আমাদের কর্তব্য পুরোপুরি পালন করছি?

পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতির গবেষণা ও উচ্চতর পঠন-পাঠন। আমরা আজকাল বুঝতে পারছি যে একদিকে যেমন গাণিতিক পদ্ধতিতে অর্থনীতির নৈয়ায়িক বিশ্লেষণের পথে আমরা চলেছি, অন্যদিকে অর্থনীতির সঙ্গে অন্য সমাজবিজ্ঞানের সহযোগ যে কতটা প্রয়োজন, সেটাও উপলব্ধি করছি। খুবই আনন্দের সঙ্গে দেখতে পাই যে অর্থনৈতিক ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থনীতির ছাত্ররা এখন পরম-উৎসাহে নেমে পড়েছেন। আগে এ বিষয়টা ছিল ইতিহাসের ছাত্রদের একচেটিয়া। বস্তুত অর্থনৈতিক ইতিহাসের গবেষণা করতে হলে গবেষককে অর্থনীতি আর ইতিহাস– দুই-ই জানতে হবে। সোসিওলজি জানা থাকলে আরো ভালো। সামাজিক তত্ত্বে বহুক্ষেত্রব্যাপ্ত বা 'মালটিডিসিপ্লিনারি' গবেষণার প্রয়োজন এখন আমরা বুঝতে পেরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন 'বিভাগে' বিভক্ত ব্যবস্থায় এ ধরনের বহুমুখী গবেষণা একটু কঠিন হয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যেসব গবেষণাকেন্দ্র আছে সেগুলিতে এই কাজ সহজেই হতে পারে এবং হচ্ছে।

গবেষণা যে পিএইচ. ডি-তেই সীমাবদ্ধ নয় এটাও অনেকে বুঝতে পারছেন। এখন হয়তো আশা করা যাবে যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে অন্তত দু-তিনটি এমন উঁচুমানের গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারব, যার মূল্যায়ন হবে আন্তর্জাতিক মানে। আমাদের বুদ্ধিমান আর বিদ্যোৎসাহী ছাত্র আছেন, পণ্ডিত অধ্যাপক আছেন (যাঁদের সসম্মানে বিদেশ থেকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়)। আমাদের নেই লাইব্রেরি, উৎসাহ আর পরিমণ্ডল। লাইব্রেরি করতে টাকা লাগে কিন্তু উৎসাহ আর পরিমণ্ডল সৃষ্টি সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। একবার অগ্রসর হলে আরো অগ্রসর হওয়া সহজ হবে, এবং তখন আমরাও অর্থনীতির গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের "উৎকর্ষ-কেন্দ্র" তৈরি করতে পারব—যে কেন্দ্র দেশের ছাত্রদের আকর্ষণ করে রাখবে এবং বিদেশী অনুসন্ধিৎসুদের আকর্ষণ করে আনবে। ডকটরেট যে গবেষণার শেষ কথা নয়, এটাই

জোর দিয়ে বলা দরকার। বলা প্রয়োজন যে বিদেশের বিশেষত ব্রিটেনের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদদের অনেকরই ডকটরেট ছিল না। যেমন মার্শাল, পিগু, কেইন্‌স্‌, হ্যারড, জোন রবিনসন। আসল কথা, কে কোন্‌ দিকে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিচ্ছেন। নামের পিছনে ডিগ্রীর সমারোহ আর জ্ঞানের প্রসারণ—সমার্থক নয়।

চতুরঙ্গর
মে ১৯৮৭ / বৈশাখ ১৩৯৪
সংখ্যায়
রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে
কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হবে

সঞ্চয়

প্রভাতকুমার মিশ্র

অনেকেই কিছু কাঠ কিনে রাখে
তার কফিন তৈরি করবার জন্যে
চন্দন থেকে নিম :
যে-কোনো কাঠ
অন্তত কিছুটা কিনে রাখে।

কেউ-কেউ
কিছুটা কাঠ কেনে
        পুতুল তৈরি করবার জন্যে
রাজা, রানী কিংবা বাউল
কলকেফুলের মতো
চমকদার পুতুল :
না হলে—
        একটা লাঙল।

আমার কোনো কাঠ নেই।
এখনো কেনা হয়ে ওঠে নি।
রাত্রি হলে
আমার সমস্ত ঘর
        শুধু জোনাকি আর জোনাকি
যেন স্বপ্নের মতো ভেসে বেড়ায়
                কিছু উজ্জ্বল কাঠের রেণু।

স্বাগতম্

শেখ মহরম আলি

তিনি এলেন, এই গাছের দেশে
বটের নামাল কিংবা ঝুড়ি নেমেছে ;
উপর থেকে নীচে
শিকড় মাটি ফুঁড়ে নেমে গেছে তলদেশে
পুকুরজলে, জলের ভিতর মাছেরা মত্ত
খেলায়, জলজ আকাশ কি জানে সে কথা ?
এসো, যাওয়া যাক, জল থেকে জলে
নদীচরে কাশফুল ক্লান্ত সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে।

ওপারে বাংলোবাড়ি
উদ্যানে হলুদ-হলুদ ফুল, বাহারি সৌন্দর্য।
স্তব্ধ মুগ্ধতায় স্থির চোখ ঠিক এঁটে যায়
দেওয়ালের টেরাকোটায় উজ্জ্বল মিথুনে
চিত্রপটে নারীর ভরাট শরীর, আহা—
তিনি এলেন, দেখলেন, তারিফ করলেন
আমাদের কুৎসিত যত সুন্দর শিল্পের, নগ্ন অবয়ব
থেকে গেল পোশাকের নীচে···
আমাদের জীবন যেমন এই গাছের দেশে
আমাদের হাততালির মতন সাধু সাধু সাধু
আমাদের কোলাহল। স্বাগতম্

উৎসমুখ

উজ্জ্বল সিংহ

একটি নিশ্চিত বিন্দু অত্যুজ্জ্বল অভিকর্ষে বৈদ্যুতিক ঝড়ে
সারাদিন সারারাত্রি আমাকে খুঁচিয়ে মারে, চাপা কণ্ঠস্বরে
বলে ওঠে 'মূর্খ জড়, ওদিকে কোথায় যাস, পূর্বদিক থেকে
পশ্চিমে চলেছে এক অভিঘাতী সংবেদন, উষ্ণ অভিষেকে
স্নাত পৃথিবীর শিরা দপদপিয়ে জ্বলে ওঠে, উত্তরমেরুর
চূড়ান্ত আসঙ্গলিপ্সা চকিতে ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণে সুদূর।'
লাল সেই বিন্দুটির চারিদিকে ঘিরে আছে যে অদৃশ্য সুতো
তার একটি প্রান্তভাগ আমার ঘিলুর মধ্যে দীর্ঘ সমুন্নত
চেতনা-খিলান গড়ে ফিরে গেছে উৎসমুখে, সমস্ত শরীর
সে মুহূর্তে রোমাঞ্চিত ; কী টানে যে ছুটে যাচ্ছি কম্পিত অস্থির—
কোন্‌দিকে! যেদিকে গর্ভ? নাকি উজ্জ্বলন্ত চুল্লি দেখে তীব্র মোহে
নিজেকে সপাটে ভেঙে মিশে যেতে চাই দ্রুত অন্য কোনো গ্রহে ?
দুচোখে রক্তের স্রোত, ঝলসে গেছে গোটা দেহ অপার্থিব জ্বরে,
নিজেকে খণ্ডিত করে উড়িয়ে দিয়েছি ঠাণ্ডা চুম্বকের ঝড়ে।

গাছের আগায় নয়

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

গাছের আগায় নয় গাছের গোড়ায় থাকা কিছু দিন ভালো
এই শান্ত সত্যটুকু বোঝা গেল—যায়, এতদিন পর এই
অন্ধকার স্থিরতায় এসে ? যায় কি ? ডালপালার পল্লবগ্রাহিতা
আকাশের গায়ে ঠেকে আছে—থেকে-থেকে যেন মহা শের
ঘাই মারছে কালো শূন্য…নীচে শিকড়…নীচে শিকড়…নীচে শিকড়
জলের চক্রজাল…মাকড়সাবীজের বুনন…ঘরন্তী লাসার ঘামলালা
শ্যাওলার আঠাখুঁট। তুমি চেয়েছিলে শুধু উচ্চতা…শুধুই মরুৎ
শুধুই ছাড়িয়ে ওঠা ঋতুরক্ত…মুঠো বাড়িয়ে ধরা নক্ষত্র
তন্তু নয়, গ্রন্থি নয়, নয় কোষবিভাজন…মূলত্রাণ শিকড়ের
পাতালধসানো ক্রোধ নয়, তুমি চেয়েছিলে হওয়া শুদ্ধ হয়ে-ওঠা
অযোনিসম্ভূত অর্কিড—তবে তাই হও—হয়ে ওঠো
মাটির আঁতুড় ছিঁড়ে কোন্ স্বর্গে নির্বাসনে যাব ?

মন্বন্তর-পর আজ আকাশে উঠেছে ভরাতারা…বসে আছি
শিখরে নয়, বিশাল এই আঁধারক্রমের পাতালে শিকড়ে
মাথার উপরে শব্দ আপ্তজ্ঞানী পল্লবের, নীচে দীন নীরবতা
মাটির নীচে কিসের অস্পষ্ট কল্লোল…কিছুর কল্লোল ?
সে কি জল ? সে কি জলের চেয়েও বেশি-নারী
যে এসে বলে যাবে—ভরো, ভরে ওঠো, আমি শূন্য রেখে দেব
তোমার ভরণী পুষা চিত্রার শূন্যতা—আমি সেই নারী
সেই মৌল অন্ধকার—শেষবার খুঁজে যাকে তুমি
শিকড়ের বুকে শুয়ে আছ।

যেখানে উত্তাপ আছে

কামাল হোসেন

সাদা রঙের অ্যামবাসাডার গাড়িটা দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল।

গাড়ির স্বচ্ছ কাচে লাল ক্রশচিহ্ন। তার মানে নির্ঘাত ডাকতারের গাড়ি।

বুকপকেট থেকে পোসটকার্ডটা বের করে ঠিকানাটা আর-একবার দেখে নিল সুবিনয়। সতেরোর এক। তার মানে এই বাড়িটা। কী আশ্চর্য, এই বাড়িটার সামনে থেকেই চলে গেল ডাকতারি-গন্ধ-মাখা সাদা অ্যামবাসাডারটা। আর ডাকতারদের উপস্থিতির কথা ভাবলেই বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে ওঠে। কারোর কিছু হল না তো! যত বয়স বাড়ছে, সামান্য কিছুতেই হাজার রকম চিন্তাভাবনা বাসা বাঁধছে মগজের মধ্যে। সেখানে এক সংশয়ী মানুষ সব সময় ভালোমন্দর হিসেব কষে চলেছে।

দরজার পাশে কলিংবেলে আস্তে করে চাপ দিল সুবিনয়। অন্দরমহলে কোথাও টুঙটাঙ জলতরঙ্গের ক্ষীণ আওয়াজ বাইরে ভেসে এল।

একতলা বাড়ি। আশেপাশে ছড়ানো-ছিটানো বেশ কিছু ঘরবাড়ি। সবই নতুন। এদিকটায় মানুষ-জনের বসতি ধীরে-ধীরে বাড়ছে বোঝা যায়। কলকাতার রাক্ষুসে ক্ষুধা গ্রাস করছে চতুর্দিক। তবু একটা মফসসলি গন্ধ এখনো রয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আর-একবার বেলের ওপর হাত দেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় দরজা খুলে গেল।

সামনে তাকিয়ে একজোড়া বোবা চোখের সম্মুখীন হয়ে প্রথমটা একটু বিব্রত হলেও সামলিয়ে নিয়ে আস্তে গলায় সুবিনয় শুধাল, 'এটাই তো অবিনাশ—মানে অবিনাশ মিত্তিরের বাড়ি? সাহিত্যিক অবিনাশ—'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো…' থেমে-থেমে কথাগুলো উচ্চারণ করল সেই মেয়ে। একেবারে ছেলেমানুষ। বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। একটা ছাপা শাড়ি অবিন্যস্তভাবে ঘরোয়া ভঙ্গিতে পরে আছে। মাথার

চুল এলোমেলো। সকালবেলায় চিরুনি পড়ে নি বোঝা যাচ্ছে।

'অবিনাশ মিত্তির এখন বাড়িতে আছে তো?' একটু ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল সুবিনয়। তার বয়স এখন একষট্টি। মোটাসোটা চেহারা। মাথায় চকচকে টাক। তবে বয়সের তুলনায় শরীরের কাঠামো এখনো বেশ মজবুত। রিটায়ার করার পর এখনো সংসারের দায়-ঝক্কি সামলাতে হচ্ছে।

মাথা নাড়ল মেয়েটি।

আশ্বস্ত হয়ে সুবিনয় বলল, 'ওকে খবর দিন, ওর ছেলেবেলার বন্ধু—ইস্কুলের বন্ধু বিনু মানে সুবিনয় এসেছে।'

'এখন তো উনি—'

'খুব ব্যস্ত বুঝি?' সুবিনয়ের গলার স্বর মলিন হয়ে আসে। তবু একটু জোর দিয়ে বলে, 'আমাকে চিঠি দিয়েছিল ওর কাছে আসতে।'

'আপনি ওর ছেলেবেলার বন্ধু?'

'ছোটোবেলা মানে ইস্কুল। ও আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তারপর যা হয়, অনেক কাল আর যোগাযোগ নেই। কাগজপত্রে ওর নাম পড়ে বুঝি এখন ও মস্ত মানুষ হয়ে গেছে। বাঙলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক।'

'উনি আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন?'

'সেটাই তো আশ্চর্য! ওর মতো বিখ্যাত মানুষ আমাকে মনে রেখেছে, এতকাল পরে চিঠি লিখে আসতে বলেছে, এটা কম বড় কথা?' পকেট থেকে চিঠিটা বের করে আইডেনটিটি কার্ডের ভঙ্গিতে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিয়ে সুবিনয় বলল, 'গত সপ্তায় এসেছে।'

নিস্পৃহ দৃষ্টিতে পোসটকার্ডে চোখ বুলিয়ে কী যেন ভাবল সেই মেয়ে। তারপর মাথা হেলিয়ে বলল, 'আসুন।'

বাইরের ঘরে সোফাতে বসে সুবিনয় অনুভব করছিল একটা অদ্ভুত অসাচ্ছন্দ্য। মেয়েটি ওপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্ক। মনটা কোথায় যেন রয়েছে। হয়তো হারিয়ে গেছে। এ বয়সে মেয়েদের চোখেমুখে এরকম আনমনা বিষণ্ণতা বোধহয় খুব স্বাভাবিক।

অনেক কাল পরে বসন্তের বাতাসের সুঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করছিল সুবিনয়। বাজারে অবিনাশের সম্পর্কে হালফিল যেসব গল্প ছড়ানো রয়েছে, এ মেয়েটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছিল না সে।

রঙিন ছাপা শাড়ির লতাপাতার চিত্রল ছায়া ঠিক যেন প্রকৃতির মতো রহস্যময়ী করে তুলেছিল মেয়েটিকে। তন্ময় হয়ে এত কী ভাবছে ওই মেয়ে? অবিনাশকে খবর দেবে না?

চিঠিটা গত সপ্তায় সুবিনয়ের হাতে এসেছে। সেই একই চেনা হাতের সুন্দর রাবীন্দ্রিক ভঙ্গিতে লেখা।

কৌতূহলটা তীব্রভাবে বেড়ে গেলেও ইচ্ছে করলেই আসা হয় না। তা ছাড়া, অবিনাশ এখন বিখ্যাত মানুষ। উইকডেজে গেলে দেখা পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই। নির্দিষ্ট কোনো সময়ও লেখে নি চিঠিতে। তাই আজকে রবিবারের সকালটাই বেছে নিয়েছিল সুবিনয়।

ভোরবেলায় মাদার ডেয়ারির দুধের প্যাকেট, হরিণঘাটার দুধের বোতল, আর বাজারের ঝামেলা মিটিয়ে তবে আসতে পেরেছে। রিটায়ার করার পর থেকে এসব কাজের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। পারকে গিয়ে বুড়োদের সঙ্গে আড্ডা দিতে মন বসে না তার। সংসারের যতটুকু প্রয়োজনে আসা যায়, তার চেষ্টা করে চলেছে সে।

ভাবলে অবাক লাগে, কদিন আগেও তার একটা নির্দিষ্ট জীবিকা ছিল। বয়সের স্বাভাবিক মাপকাঠিতে সেটাও এক সময় সাপের পুরোনো খোলসের মতো খুলে ফেলতে হল শরীর থেকে। পর-পর চোখের সামনে কেমন ঘটে যায়—এই সেদিন ছিলাম এতটুকু ছেলে, তারপর ইস্কুল, কলেজ, আফিস, রিটায়ার, সহকর্মীদের বিদায়-অভিনন্দন…কিভাবে যেন শস্যের সীমানা পেরিয়ে এই দিগন্তছড়ানো পোড়ামাটির ওপর দাঁড়িয়ে। কাঁটাবন, পাথর। এই বিস্তৃত পোড়ামাটির দেশ শেষ হলেই বুঝি চোখের সামনে ভেসে উঠবে সেই বহুপরিচিত গহ্বর, যার অতলে একদিন তলিয়ে যাবে সুবিনয় নামে একটা সাদামাটা সাধারণ মানুষের হাড়গোড়মাংসের মূল্যহীন অস্তিত্ব।…

হঠাৎ সুবিনয়ের খেয়াল হল অনেকক্ষণ তারা চুপচাপ রয়েছে। ভাবলেশহীন মুখে মেয়েটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে একপাশটিতে। গলাটা একটু পরিষ্কার করে কোশে নিয়ে সুবিনয় বলল, 'অবিনাশ কি এখন কিছু লেখাটেখায় ব্যস্ত? আমি তাহলে অন্য একদিন…'

'না—না—আপনি এখনই চলে যাবেন না।' মেয়েটির গলায় ব্যগ্রতা ফুটে ওঠে।

খানিক আগের ডাকতারের গাড়ির কথা মাথায় আসতে সুবিনয় বলে ফেলে, 'অবিনাশের শরীর ভালো আছে তো?'

চোখের ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে মেয়েটি। ওর পিছু-পিছু ভেতরে একটা বড়োমতো ঘরে ঢোকে সুবিনয়। দেখেই বোঝা যায় বেডরুম। সুন্দর রুচিপ্রদভাবে সাজানো। একপাশে বইয়ের আলমারিতে অবিনাশের সারা জীবনের সৃষ্টি ঝলমল করছে। ছোটোবড়ো সুদৃশ্য আসবাবপত্র। জানলায় ভারি পরদা ভেদ করে বেশি আলো ঢুকতে পারছে না ঘরের ভেতরে। ছায়াঘন নরম পরিবেশ।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সুবিনয় অনুভব করল এক অস্বস্তিকর গুমোট। আর অবিশ্বাস্যরকম স্তব্ধতা।

সাদা ধবধবে বিছানা। অবিনাশ শুয়ে আছে ঘাড় কাত করে। চোখটা আধবোজা। ঠোঁট অল্প ফাঁক।

যদি ঘুম ভেঙে যায়, এরকম সতর্ক গলায় সুবিনয় বলল, 'এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে, শরীর কি ভালো নেই ওর?'

মেয়েটি যেন কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, শুনতে পাচ্ছিল না।

সুবিনয় আবার বলল, 'আমি এ বাড়িতে আসার আগে দেখেছি একটা ডাকতারের গাড়ি চলে যেতে…'

'ড. ঘোষ এসেছিলেন।'

'কী হয়েছে অবিনাশের?'

'ড. ঘোষ বলে গেলেন, ও কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে।'

'অ্যাঁ!' মাথা টলমল করে ওঠে সুবিনয়। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে না। বিছানার একপাশে বসে পড়ে। কী নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে অবিনাশ। তার খ্যাতির সৌরভ জাফরিকাটা জ্যোৎস্নার মতো অতীব মায়া মনে হচ্ছে। ঠোঁটের কোনায় কি চিকচিক করছে একটুকরো উদাসীন হাসি?…

কেমন সব গণ্ডগোল পাকিয়ে যায় সুবিনয়ের। তবু জিজ্ঞেস করতে হয়, 'কী হয়েছিল?'

'কাল রাতেও তো ভালো ছিল। ভোরবেলায় হঠাৎ বুক-ব্যথা বলছিল। ড. ঘোষ নামজাদা ডাকতার। ওর বন্ধু। কাছে থাকেন। উনি এসেছিলেন। নারসিং হোম নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিলেন। সেটুকুও সময় পাওয়া গেল না।' বড়ো একটা শীতের মাঠে হাঁটতে-হাঁটতে স্বগতোক্তির মতো বলল মেয়েটি।

যে কথাটা অবিনাশকে শুধোবে বলে এসেছিল, এতক্ষণে আপনা থেকেই সুবিনয়ের গলায় হাহাকারের মতো ধ্বনিত হল, 'কিন্তু আমার তো জানা হল না, কেন ও আমাকে এত কাল পরে ডেকে পাঠিয়েছিল?'

'কিছুটা আমি বলতে পারি। ইদানীং ও ছেলেবেলার স্মৃতিকথা লেখবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। তাই একে-ওকে জিজ্ঞেস করে পুরোনো বন্ধুদের, আত্মীয়দের ঠিকানা জোগাড় করে দেখা করার জন্য চিঠি লিখছিল। সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা গল্পগুজব করে তারপর ছেলেবেলার কথা লিখতে বসবার ইচ্ছে ছিল।'

'কিন্তু আমি এলাম, অথচ…'

‘হ্যাঁ, ওর ছেলেবেলার জগৎ থেকে আপনি প্রথম মানুষ এলেন আমাদের বাড়িতে, কিন্তু মানুষটা চলে গেল। আপনার সাথে দেখা হলে কত খুশি হত!’

অবিনাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একটা অসম্ভব শূন্যতা অনুভব করছিল সুবিনয়। হাজার চেষ্টা করেও শৈশবের কোনো জলজ ঘাসের অন্ধকার ছিন্ন করে নতুন করে কিছু মনে পড়ছিল না। পিছু ফিরে তাকালে শুধু শ্যাওলার জঙ্গল…

মাথা তুলে সুবিনয় বুঝতে পারল একজোড়া ঘন গভীর চোখ তাকে পর্যবেক্ষণ করছে।

কী মনে হতে সুবিনয় জিজ্ঞেস করল, ‘বাড়িতে আর কেউ নেই?’

মাথা নাড়ল মেয়ে, ‘এ বাড়িতে শুধু আমরা দুজনে থাকতাম। ও আর আমি।’

‘আপনি…’ কী জিজ্ঞেস করবে বুঝে পেল না সুবিনয়।

‘আমি সুমিতা। আপনার বন্ধু মিতা বলে ডাকত।’

‘ও।’ ভদ্রতার গণ্ডি পেরিয়ে আর কীই বা শুধানো যায়। অবিনাশ ওকে মিতা বলে ডাকত, এটুকু জানাই যথেষ্ট।

এতক্ষণে মেয়েটি যেন অনেকটা সহজ হতে পেরেছে। সে বলল, ‘বছর দুয়েক আমরা এ বাড়িতে ভাড়া আছি।’

‘শুনেছিলাম অবিনাশ বালিগঞ্জে নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে।’

‘যেটা কিনেছিল, সেখানে ওর বউ, ছেলে, ছেলের বউ—ওরা সবাই থাকে। ফ্ল্যাটটা আসলে বউয়ের নামে কিনেছিল তো।’

‘ওরা কেউ সেখানে তোমাদের থাকতে দেয় নি?’

সুমিতার চোখেমুখে কোনো লজ্জা আর আড়ষ্টতার ছাপ ফুটে উঠল না। বলল, ‘ও চেয়েছিল একটা ঘরে আমরা নিজেদের মতো থাকব। ব্যাচারেলি ও পক্ষের কেউ ব্যাপারটা মানতে চাইল না। অথচ আমাদের কাছে এ সম্পর্কটাও কম মূল্যবান নয়। কাজেই—’

সুবিনয় সবটা ভালো করে বুঝতে পারল না। মাথা মাড়ল। এই মুহূর্তে তার নিজস্ব ভূমিকা সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা সে করতে পারছিল না।

সুমিতা অন্যমনস্কভাবে তাকাল। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে এই ঘরোয়া পরিবেশে। আশ্চর্য সারল্যমাখা চোখদুটি।

সুবিনয় বলল, ‘এ বাড়িতে এর পর থাকতে আপনার অসুবিধা হবে না?’

মাথা নীচু করে কী যেন ভাবল সুমিতা। বলল, ‘জানি না। কেন বলুন তো?’

‘এমনি মনে হল।’ বিব্রত গলায় সুবিনয় বলল, ‘বাড়িটা তো অবিনাশের নামে বোধহয় ভাড়া নেওয়া আছে।’

‘হ্যাঁ, সেটাও ঠিক। আর আমি তো চাকরিবাকরিও কিছু করি না, ভাড়া দেব কিভাবে মাসেমাসে? অবিশ্যি,’ একটু থেমে সুমিতা নরম গলায় বলে, ‘আসল মানুষটাই তো আর বেঁচে নেই।’ ও এমন মুখভাব করল, মনে হল এরপর কী হবে ওর কিছু ভাববার নেই।

চারপাশ শান্ত আর স্থির। ওপাশে গিয়ে সুইচ টিপে ফ্যানটা চালিয়ে দিল সুমিতা।

খানিক পরে সুবিনয় বলল, ‘তোমার, মানে আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?’

‘আমায় তুমি বলবেন।’ একটু তরল গলায় সুমিতা বলল, ‘আমার বাড়ি মানে বাপের বাড়ির কথা বলছেন?’

একটু হালকা হবার চেষ্টা করল সুবিনয়, ‘মা বাবা ভাইবোন?’

‘আছে। আবার থেকেও নেই।’

‘সেরকম হয় নাকি?’

‘বাবা তো বেঁচে নেই। বছর দশেক আগে। ক্যানসার। স্টমাকে।’

‘ও।’

সুমিতার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে লাগছে। কেমন শীত-শীত লাগছে। গায়ে একটা চাদর দিলে হত। সবকিছু কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে। চোখের পাতাদুটো টনটন করছে। শোকে, নাকি স্মৃতির ভারে? সুবিনয়ের দিকে একবার চাইল। উনি কী যেন বলছিলেন। হয়তো নিছক কৌতূহল। কোনো অন্যায় প্রশ্ন না। আসলে ঠিকমতো গুছিয়ে কিছু ভাবতে ভালো লাগছে না। একটা অদ্ভুত আলসেমি তাকে ধীরে-ধীরে গ্রাস করছে।

‘মায়ের কিন্তু এ বিয়েতে মত ছিল না।’ সুমিতা হঠাৎ বলল।

‘বিয়ে! ও হ্যাঁ, তোমাদের বিয়ে। তোমার আর অবিনাশের’, অপ্রস্তুত গলায় সুবিনয় বলল।

তার বিব্রত চোখমুখ দেখে রাগ করতে পারল না সুমিতা। সবটাই তো আসলে সংস্কার। অগ্নি সাক্ষী রেখে যজ্ঞ করে বিয়ে বলতে যে ছবিটা ছোটোবেলা থেকে মগজে সেঁধিয়ে বসে আছে, নিজের জীবনে সে জিনিসটা হল না বলে একটা দুঃখের কিংবা পরাজয়ের চোরাস্রোত কি বুকের মধ্যে তিরতির করে বয়ে যায় না?

‘আমাদের সামাজিক বিয়ে হয় নি। কিন্তু আমার জন্য ও এত কালের ঘরসংসার বাড়িঘর সব ছেড়ে চলে এসেছিল।’ সুমিতা ধীরে-ধীরে বলল।

সুবিনয় কিছু বলল না। চুপচাপ চেয়ে থাকল।

‘আজকাল অবিশ্যি ও আগের বউকে ডিভোরসের কথা বলত। আমরা যদিও সামাজিক ছাড়পত্রর পরোয়া করি না, তবু একটা রেজিসট্রি বিয়ে না হলে নাকি আমাদের ছেলের খুব অসুবিধা হবে ভবিষ্যতে।’

‘ছেলে? তোমাদের ছেলে?’ চমকে উঠে চারপাশে আর-একবার তাকাল সুবিনয়।

‘জানি না ছেলে হবে না মেয়ে। তবে ওর মতো দেখতে হলে খুব ভালো লাগবে।’ লজ্জাপাওয়া গলায় সুমিতা বলল।

বাইরে কোথাও কামিনী ফুল ফুটেছিল। মৃদু সুগন্ধি হাওয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। সুমিতার ভরন্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে সুবিনয় অভিজ্ঞ চোখে সবটা বুঝতে পারল। এতক্ষণ কেন ব্যাপারটা তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। নিজেকে ভারি বোকা মনে হচ্ছিল।

‘কী বিপদ দেখুন, টেলিফোনটা মাসখানেক ধরে খারাপ। খবর দেওয়া হয়েছে, কিছুই হচ্ছে না। মাঝেমধ্যে রিঙ বাজে, ফোন তুলে কোনো শব্দ কানে আসে না। কেউ নিশ্চয়ই ডাকে, যোগাযোগ করতে চায়, অথচ ঠিকমতো যোগাযোগ হয় না।’

‘অবিনাশের কত চেনাজানা। বিখ্যাত মানুষদের সান্নিধ্য সবাই চায়।’

‘ও কিন্তু খুব বেশি মানুষের ভিড় সহ্য করতে পারত না। ওর নিজস্ব পছন্দের কয়েকজন মানুষ ছাড়া বেশি কারুর সঙ্গে মিশত না। তবে সম্পাদক, পাবলিশার, লেখকবন্ধু, গুণগ্রাহী, সভাসমিতির ডাক—এসব তো লেগে থাকতই। উপায় ছিল না।’

‘বিখ্যাত মানুষদের এসব ঝামেলা পোয়াতেই হয়।’

‘অথচ জানেন, মানুষটা কী প্রচণ্ড ভালোবাসত নির্জনতা। এক-একটা রাত…’

রাত মানেই বুঝি নির্জনতা। পাতাবাহারের ঝোপ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বারান্দার এক কোণে। ক্যাকটাসের কাঁটাবেঁধা শরীরে কোমল শ্রান্তি। বোধহয় বাতাস অনেকক্ষণ বইছে না। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে আছে অবিনাশ। হাতের গেলাসে টলটলে স্বাদু স্কচ। ঘরের ভেতর থেকে স্টিরিওতে তরল সোনার মতো প্রতিবেশে ছড়িয়ে পড়ছিল মেহেদি হাসানের গজল…পাত্তা পাত্তা বুটা বুটা…দিল হামারা …বুকের কাছটিতে এক অর্ধনগ্না নারী। অন্যমনস্কা কিংবা ভালোবাসার অফুরান ঝরনায় সিক্তা। কতটা পথ ওরা দুজনে হাত ধরে হেঁটেছে কল্পনা করতে পারে না সুবিনয়। এক-একটি মুহূর্ত অতিক্রম করতেও তো কতখানি দীর্ঘ পথ হেঁটে যেতে হয়। সূর্যঘড়ির আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে যায় প্রবল তৃষ্ণায়।…

'কিন্তু খবরটা বাইরে সবাইকে তো দিতে হবে। আমাদের এরকম চুপচাপ বসে থাকা বোধহয় উচিত হবে না। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি, বন্ধুবান্ধব, আর'—একটু সময় নিয়ে সুবিনয় বলল, 'ওর বউ ছেলে—আফটার অল…'

'হ্যাঁ, সবাইকে খবর দিতে হবে। দিতে তো হবেই।' একটু জোর দিয়ে বলে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে গেল সুমিতা।

'এটা মৃত্যুর ব্যাপার। বেশি দেরি হলে সবাই তোমাকে মানে আমাদের দুজনকেই দোষ দেবে।' ব্যগ্রভাবে সুবিনয় বলল।

'ড. ঘোষ সব জায়গায় ফোন করে জানিয়ে দেবেন বলেছেন। আমাদের ফোন খারাপ উনি জানেন। এতক্ষণে সবাই জেনে গেছে নিশ্চয়ই।'

'খবর পেলেও কলকাতা থেকে এতটা দূরে আসতে একটু সময় লাগবেই।' গম্ভীর গলায় সুবিনয় বলল।

'কিন্তু সবাই এসে গেলে যে আমি একা হয়ে যাব।'

জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল সুবিনয়।

'ওই মানুষটা তখন ওদের সম্পত্তি হয়ে যাবে। আমাদের সম্পর্ক নিয়ে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠবে সকলের চোখে।' অসহায়ভাবে সুমিতা বলল।

সুবিনয় কিছু বলতে পারল না।

অনেকক্ষণ কী মনে করার চেষ্টা করল সুমিতা। তারপর আত্মগতভাবে বলল, 'দু বছর—যেন দু যুগ। কতকালের আগের কথা মনে হয়। তখন কলেজে পড়ি। বি. এ. সেকেণ্ড ইয়ার। আমাদের কলেজের সাহিত্য-অনুষ্ঠানে এসেছিল। সেই প্রথম পরিচয়। আমার থেকে বয়সে ও অনেকখানি বড়ো। ওর ছেলেও আমার থেকে বয়সে বড়ো, জানেন বোধহয়।'

'ইয়ে'…একটু দ্বিধাজড়ানো গলায় সুবিনয় বলল, 'এখন ওসব চিন্তা করে লাভ কী বলো?'

'লাভ-লোকসান কিছুই নেই। তবু আর কারুকে তো আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। আপনার সঙ্গেও আর কোনো দিন দেখা হবে না…'

'না—দেখা হবে না।' খুব শান্ত মনে এই সরল সত্যটি মেনে নিতে কি সুবিনয়ের কিছু কষ্ট হল? গলার কাছে একটা গোলাকার মতো কী যেন আটকে গেল। কোনো অপরাধবোধ? নাকি নিতান্তই পরাজিত মানুষের আত্মগ্লানি? এক ধরনের হীনম্মন্যতা?

এরকম নদীর মতো আশ্চর্য সুন্দরী কমলিনী যুবতীর জন্যই কি জন্মের পর জন্ম পথ হাঁটে পুরুষ? এত কাছাকাছি এমন মোমের পুতুলের মতো অপূর্ব মহার্ঘ নারী কখনো দেখে নি সে। সারাটা জীবন এরা স্বপ্নে-স্বপ্নে দেখা করে গেছে। বুকের ভেতরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করে সুবিনয়। অবিনাশকে হিংসে করতে ইচ্ছে হয়। সমস্ত সামাজিক বিধিনিয়ম তুচ্ছ করে সে কেমন চমৎকারভাবে ভোগ করে গেছে এই মধুময়ী নারীর প্রেম, অনুরাগ ও যৌবনের রঙিনতম সুবাস। একটামাত্র মানবজীবন ধন্য হয়ে গেছে। অথচ মজার ব্যাপারটা দেখো, অদ্ভুত ঘটনাচক্রে সুবিনয়ের জীবনেও এল একটা সুযোগ। এল, কিন্তু বড়ো অসময়ে। এই নারীর পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। তার ওপর জঠরেও খেলা করে চলেছে অমোঘ মন্ত্রের মতো এক মানব ভ্রূণ। বড়ো অসহায় এই মেয়ে। জীবনের এই বিচিত্র সন্ধিলগ্নে সুমিতার আজ বড়ো প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ অবলম্বন। বস্তুত জীবনের প্রবাহ কোথাও শেষ হয়ে যায় না। প্রকৃতিও সহ্য করতে পারে না এতটুকু শূন্যতা। অবিনাশ নেই বলেই কেন একা হয়ে যাবে এই মেয়ে? সুবিনয়ের বুকের ভেতরেও কি বেঁচে নেই এক চিরকালের যৌবন? ইচ্ছে করলে সেও তো পারে শক্ত হাতে হাত ধরে পার করতে জলপ্রপাত। মধ্যনিশীথে ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারে বহু দূরের কোনো রূপকথার গ্রামে, যেখানে সম্পর্ক ও পাপবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না কোনো সামাজিক মানুষ। প্রেম আর যন্ত্রণার আগুনে পবিত্র হয়ে পরস্পরকে চিরকালের মানব-মানবীর মতো আলিঙ্গন করবে দুজনে। ওষ্ঠে ওষ্ঠ রেখে নিবিড় বিস্ময়ে অনুভব করবে পৃথিবীর সবথেকে তৃপ্তিকর অনুভূতি।

হল না—হবে না—এতটুকু সাহস নেই সুবিনয়ের। নিজের অক্ষমতার প্রতি ভয়ংকর ক্রোধ আর হতাশায় ফেটে পড়তে গিয়ে সংযমের প্রতিটি দেওয়াল নড়ে ওঠে। কী সাংঘাতিক শত্রু এই সময়—তার বয়স—শরীরের কত রকম প্রতিকূলতা; এবং অবশ্যই মধ্যবিত্ত মানুষের চারপাশে শেকড় ছড়ানো ছোটোবড়ো কত কিছু পিচ্ছিল সুড়ঙ্গপথ। ইচ্ছে করলেও ছোঁয়া যায় না অমৃতের পাত্র। প্রচণ্ড অসহায় অবস্থায় অচঞ্চল বসে থাকে সুবিনয়। বুকের ভেতরে অগ্নি জ্বলে-জ্বলে ছাই হয়ে যায়। নিবন্ত আগুন নরম তুষের ভেতর বেঁচে থাকে সে। ক্ষরণ হয়। হাজার সাধ থাকলেও কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সামর্থ্য বা সাহস আজ তার নেই।

কোন্ দিনই বা ছিল? ছেলেবেলা থেকেই শুধু ভীরুতা আর কাপুরুষের মতো বেঁচে এসেছে সে। সাহস করে পাশের বাড়ির লাবণ্যকে মুখ ফুটে এক-আধটা ভালোমন্দ কথা বলতেও বুক কাঁপত সেই প্রথম কৈশোরে। শুধু চোখে-চোখে তাকানো। জানলার পাশ থেকে দর্শনকামীর মতো পর্যবেক্ষণ করে গেছে নিত্য পরিবর্তনে বৃদ্ধিশীল রঙিন কিশোরীর চড়াই-উতরাই। তখন মনে হত ওসব অন্যায়, ওসব পাপ। তারপর যেমন হয়, কোথা দিয়ে কেমন করে দ্রুতবেগে কলেজ-জীবন চলে গেল। গ্র্যাজুয়েট হয়ে সরকারি অফিসের কেরানির চাকরি। বাবার পছন্দমতো সম্বন্ধকরা মোটামুটি গোলগাল মালতীর সঙ্গে বিয়ে। চারটি ছেলেমেয়ে। তাদেরকে মানুষ করা, মেয়েদের বিয়ে দেওয়া, গড়গড়িয়ে ছ্যাকরা গাড়ি চালিয়ে সে শুধু ছুটেই চলেছে এক গলি থেকে আর-এক গলিতে। শুধু কর্তব্য আর অবহেলার হাজারো ফিরিস্তি। ত্রুটি-বিচ্যুতির হাজারো রকম হিসাব কষা। বউ ছেলেমেয়ে সকলের চোখে আজ সে পয়লা নম্বরের অপদার্থ মানুষ। কখন যেন জীবন থেকে সমস্ত রকম সচ্ছলতা সমস্ত রকম উৎসাহের মোমবাতি ধীরে-ধীরে নিবে গেছে। হঠাৎ একদিন লোকে বলল, তুমি বুড়ো হয়ে গেছ, কাজ থেকে অবসর নিয়ে বানপ্রস্থে যাও।

যাও বললেই কি যাওয়া হয়? সকালবেলায় মাদার ডেয়ারির দুধের প্যাকেট, হরিণঘাটার দুধের বোতল আনতে হয়, তারপর বাজার, দোকান, রেশন, নাতিনাতনীদের ইস্কুল থেকে নিয়ে আসা, টুকিটাকি আরো কত কিছু।

নিজের চোখের সামনে হাতখানা তুলে ধরল সুবিনয়। ত্বকে এখনো আসে নি কোনো শিথিলতা। সবাই বলছে বলেই কি আমি বুড়ো হয়ে গেলাম? ধমনীতে কি বইছে না সেই একই রক্তস্রোত? অন্তরের কোনো গোপন গুহায় ধ্বনিত হয় না স্বপনসঞ্জাত সেই সুন্দরীর জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা? হৃদয় কি এখনো অনুবাদ করে না কিছু-কিছু নিজস্ব সংলাপ?

চুপচাপ। কেউ বুঝি কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না। সুমিতা ইতস্তত পায়চারি করছে। তার ভেতরে একটা পাখি ছটফটিয়ে মরছে, সুবিনয় বুঝতে পারছিল।

ঘরের কোণে একটা ছোটো টেবিলের ওপর টু-ইন-ওয়ান। হঠাৎ কোনো কিছু না ভেবেই টেপের একটা বোতামে চাপ দিল সুমিতা। …রইল তাহার বাণী, রইল ভরা সুরে…সমস্ত নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে এক মেয়ের খোলা গলায় রবীন্দ্রনাথের গান ভাসিয়ে দিল এই ঘর, এই প্রহর, সকলের অস্তিত্ব।

অপ্রস্তুতভাবে টেপ বন্ধ করে দেয় সুমিতা। গান বুঝি শোকের পরিবেশের গাম্ভীর্য লঘু করে দেয়। এমন স্তব্ধতা ভালো। ইচ্ছে হলেও সুবিনয় বলতে পারে না, পুরোটা শুনি, ভারি মিষ্টি গলা। একটু পরে কী ভেবে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে গেয়েছে?'

'আমি। কাল রাতে।'

রাত মানে কতখানি নিবিড়তা অনুভব করতে

গিয়ে বুকের ভেতরে পুরোনো ব্যথায় হাত রাখে সুবিনয়। এই নারীর কণ্ঠের গানে ছলকিয়ে ওঠে অন্তরঙ্গ বাতাসের শিহরিত আঘ্রাণ। সুর যেন স্মৃতিহীন ঝরনার ধারা। শুধু অবগাহনে শান্তি, যার কোনো অতীত নেই।

‘জান, অবিনাশ বিয়ে করেছিল প্রেম করে। সে একটা বিরাট ঘটনা তখন আমাদের অল্প বয়সে।’ সুবিনয় যেন পুরোনো দিনের গল্প শোনানোর ভঙ্গিতে বলে।

মাথা নেড়ে সুমিতা বোঝাল সে জানে সবকিছু।

‘একটা সময় ওদের অনেক স্ট্রাগল গেছে। অসবর্ণ বিয়ে। দুপক্ষের আত্মীয়স্বজন কেউ কোনো হেল্প করে নি। লেখক হিসেবেও তখন একেবারে নতুন।’

‘হুঁ, অনেক গল্প শুনেছি ওর আগের জীবনের।’

‘তুমি শুনতে? রাগ হত না? ঈর্ষা হত না?’

‘কেন? রাগ হবে কেন? যে মানুষটাকে ভালোবাসি, সে কত পরিশ্রম করে রক্ত ঝরিয়ে ঘাম ঝরিয়ে বড়ো হয়েছে, সে গল্প শুনে আমার বুক গর্বে ফুলে উঠবে না?’

‘কিন্তু—কিন্তু সে গল্পে তোমার কোনো ভূমিকা নেই।’

‘গল্প তো একটা থাকে না মানুষের জীবনে। কোনো গল্পের নায়িকা থাকলই বা আর-একজন, তখন পটভূমি ছিল ভিন্ন, সময় ছিল ভিন্ন।’

‘সত্যি-সত্যি তুমি সুখী হয়েছ ওর সঙ্গে সংসার করে?’ কেমন যেন হিংসুটে গলায় জিগ্যেস করল সুবিনয়।

‘সুখ? কাকে বলে সুখ জানি না। শুধু বুঝি, মানুষটার জীবনে শেষ দুটো বছরে আমিই ছিলাম সবথেকে বড়ো সত্যি। সে আমার গভীরে ডুব দিয়ে আকণ্ঠ পান করে তৃষ্ণা মেটাত, বলত, আমি যযাতির মতো যৌবন ফিরে পাচ্ছি। নতুন করে সৃষ্টির প্রেরণা খুঁজে পাচ্ছি।’

সুবিনয়ের চোখে শুধু ধ্বংসস্তূপের ধূসর ছবি।

‘বিড়লা আকাদেমিতে র‍ঁদার একটা একজিবিশন হয়েছিল। দেখতে গেছলেন?’

গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থাকল সুবিনয়।

‘ওখানে একটা ভাস্কর্য খুব পছন্দ হয়েছিল ওর। ইটারন্যাল স্প্রিং। অনন্ত বসন্ত। চিরকালের দুই পুরুষ আর নারী পরস্পরকে চুম্বনে ব্যস্ত। কী গভীর ভালোবাসা। ও বলত, র‍ঁদা নিশ্চয়ই আমাদের দুজনকে ভেবে ওই মূর্তি গড়েছেন।’

কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল না সুবিনয়ের। দেওয়ালে অনেকগুলো ছবি। কোনোটাতে আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তি। কোনোটাতে রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্তি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটা। কিছু ব্যক্তিগত ঘরোয়া ছবি সুমিতার সঙ্গে। সব ছবির নায়ক অবিনাশ। যে চিরবসন্তের স্বপ্ন দেখেছিল।

চোখ না তুলেও সুবিনয় বুঝতে পারল সুমিতা কিছু ভাবছে। কী একটা কৌতূহলে সুবিনয় বলল, ‘ওর আগের বউয়ের সঙ্গে কোনোদিন আলাপ হয়েছে?’

‘প্রথম দিকে। পরে আমাদের ব্যাপারটা যখন বুঝতে পেরেছিল, তখন খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল।’

‘তোমার রাগ হয় না?’

‘রাগ করে কী লাভ আছে বলুন। আমি শুধু ভাবি, ওর জীবনে আগেও তো অনেক প্রেম এসেছে। ওর সেই আইনসম্মত স্ত্রী কি পেরেছে সেসব সম্পর্ক অস্বীকার করতে? আমি অবিশ্যি কোনো দোষ দিই না। স্বামী অন্য নারীর আকর্ষণে ধরা দিলে হিংসে, জ্বালা—এসব তো হতেই পারে। তখন নিজের শূন্যতা বুঝি ধরা পড়ে যায় নিজের কাছে। যে কোনো মেয়ের কাছেই সেটা ভারি লজ্জার।’

সুবিনয় চুপচাপ শুনে যায় সুমিতার কথা।

‘ব্যাপারটা আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। আসলে আমাদের সম্পর্কটাও ঠিক প্রচলিত আটপৌরে হিসেবে ধরা পড়ে না বলেই হয়তো। তবে আমার নিজের জীবনে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে মনে হয়—ওই মানুষটার কাছে সমস্ত নারীই ছিল প্রকৃতির মতো অনন্ত রহস্যে ভরা। নদী পাহাড় অরণ্য সমুদ্র কিংবা আকাশ। প্রতিটি হৃদয় খুঁড়ে-খুঁড়ে শিশুর মতো রক্ত ঝরাত সারাটা রাত্তির ধরে। তারপর গভীর যন্ত্রণায় কলম নিয়ে বসত। কাগজের বুকে অক্ষর সাজিয়ে ছবি আঁকত।’

‘তার মানে ওর কাছে আর সব নারীর মতো তুমিও ছিলে একজন সাধারণ কেউ? আজ না হলেও কালকেও বিনা দ্বিধায় ত্যাগ করত তোমায়। মেনে নিতে পারতে?’

‘হুঁ, রাগ করতাম, ঝগড়া করতাম, মাথা ঠুকে-ঠুকে হয়তো মরে যেতাম। এই দুটো বছরে ওকে কতটা দিতে পেরেছি জানি না। কিন্তু যা পেয়েছি, আমার মতো সামান্য মেয়ের জীবনে সেটাও তো কম মূল্যবান নয়।’

সুমিতার চোখের দিকে এবার স্পষ্ট করে তাকাল সুবিনয়। মেয়েটাকে কখনো চেনা কখনো অচেনা মনে হচ্ছে।

সুবিনয় বলল, ‘শোনো, আমাদের দিক দিয়ে কিন্তু প্রচণ্ড অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। আমি কাছের কোনো ওষুধের দোকানে গিয়ে ফোন করে আসি। খবরটা সকলকে জানানো দরকার তাড়াতাড়ি। তোমার অসুবিধা হবে না তো একা-একা থাকতে?’

অভিমানী গলায় সুমিতা বলল, ‘এই মুহূর্তে চুপচাপ একা বসে থাকতে আমার ইচ্ছে করছে না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভালো লাগছে। চিন্তা করবেন না। ড. ঘোষ ঠিকই সব জায়গায় খবর দেবেন। আর খানিক বাদে সবাই এসে গেলে আপনি আমি দুজনেই তো ওর কাছাকাছি বসে এভাবে সহজভাবে গল্প করতে পারব না। সবাই বাতিল করে দেবে আমাদের।’

‘বাতিল করে দেবে।’ উচ্চারণ করল সুবিনয়।

‘হুঁ, তখন আমি আপনি কে? আপনি ওর ছেলেবেলার সবথেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কত জনকে জিজ্ঞেস করে ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লিখে আসতে বলেছিল আপনাকে, সে তো আপনার মধ্যে ওর নিজের ছেলেবেলাকে খুঁজে পাবার জন্যই। আর আমি? ওদের চোখে আমি তো একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়ে। সামাজিকভাবে বিয়ে হয় নি। সুতরাং নিতান্তই একজন রক্ষিতা ছাড়া আমার আর কী পরিচয়? অথচ দেখুন, আমার মধ্যে যে শিশুটা দিন-দিন বড়ো হচ্ছে, নড়াচড়া করছে এই পৃথিবীর আলো দেখবার জন্য, সে তো ওই মানুষটারই আর-একটা অস্তিত্ব। ওর মধ্যেই ও বেঁচে থাকবে আরো কতকাল।’

‘আসলে এসব সামাজিক ব্যাপার। দুঃখ পেতে নেই।’ বিড়বিড় করে সুবিনয় বলল।

‘ওরা ওকে শ্মশানে নিয়ে যাবে? ও বলত, যদি কখনো মৃত্যু হয়, বন্ধুরা যেন কাঁধে করে খোলা আকাশের নীচে হাঁটতে-হাঁটতে ওর দেহ বহন করে নিয়ে যায়। জানেন, ভাবতে পারছি না, আর বেশিক্ষণ ওকে কাছে পাব না।’

অবিনাশের মৃতদেহর কাছে চুপচাপ বসে থাকে সুমিতা। অবিনাশের একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের গালে ঠেকায়, তারপর চুলে, নাকে, চোখে, চিবুকে, ঠোঁটে। স্পর্শের অচঞ্চল শীতলতা খুব নিবিড়ভাবে অনুভব করতে থাকে সে। একটা বিশাল শিরীষ গাছের ডালপালা তার সমগ্র অস্তিত্বে জড়িয়ে ধরে।

কী আর সান্ত্বনা দেওয়া যায় এই শোকতাপে দীর্ণা রমণীকে? অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে সুবিনয়। তারপর এক সময় বলে, ‘তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?’

‘কষ্ট!’ অবাক চোখে তাকায় সে মেয়ে।

‘আমি তোমার কথা জিজ্ঞেস করছি।’

‘আমার কথা!’ কী রকম অদ্ভুতভাবে হাসল সুমিতা। বিষণ্ণতার পরতে-পরতে আশ্চর্য রহস্যময় মাধুরী মেশানো। একটা সন্ধের কথা মনে করবার চেষ্টা করল সুবিনয়। বোধহয় আকাশে চাঁদ উঠেছিল।

শুক্লপক্ষের। একটা নিরিবিলি গাছ। দু-চারটে শুকনো পাতা মাঝেমাঝে খসে পড়ছে। দূরে হ্রদের জলে শান্ত নীরবতা। গাছের নীচে দুজনে। মানুষ মানুষী। মানুষীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে মানুষ। বসন্তের মৃদু বাতাস অন্য পৃথিবীর স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সমস্ত প্রেক্ষাপট জুড়ে সুখ আর বিষণ্ণতার আবহ। সুবিনয় ভাবে, ওই নারী সুমিতা হলে মন্দ হত না। আঃ, এরকম একটি সন্ধ্যা কেন আমি সারাটা জীবনেও পেলাম না, আক্রোশে আর হাহাকারে বুকের ভেতরে ভাঙচুর শুরু হয়ে যায়। সেই একই নিয়মে প্রতিদিন সূর্য ওঠে আর ডোবে। দিনের পরে যায় দিন। শাখাপ্রশাখার মতো দুলতে থাকে সময়ের শতধা-বিস্তৃত কাণ্ড। তার মধ্যেই কতজনে কৃষিকার্য করল, ফসল ফলাল। ভূগর্ভ থেকে কেউ আবিষ্কার করল মূল্যবান হীরকখণ্ড। কত কিছু পাওনা থাকে একটামাত্র দুর্লভ জীবন থেকে। কেউ পায়, কেউ পায় না। ঐশ্বর্য সুখ প্রেম ভালোবাসা—এসব বুঝি জোর করে আদায় করে নিতে হয়।

সুমিতা উঠে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। অবিনাশের লেখার টেবিল। কাগজপত্র বই কলম এলোমেলোভাবে ডাঁই করে রাখা। একটা টাইমপিস ঘড়ি তুলে নিয়ে দম দিতে থাকল সে।

সুবিনয়ের নিঃশব্দ চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'রোজ সকালে নটায় এটায় দম দেওয়া নিয়ম। আজ ভুলে গেছলাম। দম না দিলে বন্ধ হয়ে যাবে।'

কেমন অসহায় বোধ করছিল সুবিনয়। মেয়েটির সাথে আজকেই প্রথম আলাপ হল। তাও এরকম অসময়ে। এখন আর সাজিয়েগুছিয়ে কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করছে না! মেয়েটি বড়ো দুঃখী। কাঁচা বয়স। সংসারে আরো কত ঝড়ঝাপটা বয়ে যাবে ওর ওপর দিয়ে। পেটের বাচ্চাটা কার মতো দেখতে হবে কে জানে। অবিনাশের মুখের ছাপ থাকলেও থাকতে পারে। সুবিনয় দেখতে পেল বৃষ্টির মধ্যে বাচ্চাটিকে বুকে নিয়ে ভিজতে-ভিজতে হেঁটে চলেছে সুমিতা। আশেপাশে কোনো গাছ নেই, যার তলায় দাঁড়াবে। এক যন্ত্রণাদায়ক নির্জনতার মধ্যে দিয়ে মেয়েটা হেঁটে যাচ্ছে আর হেঁটে যাচ্ছে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সুবিনয় শুধু দেখে যেতে পারে এই বিষণ্ণ দৃশ্য। ছুটে গিয়ে কোনদিন বলতেও পারবে না, 'হ্যাঁ, মেয়ে, বৃষ্টিতে ছোট বাচ্চা নিয়ে এরকম ভিজতে আছে? এসো আমাদের ঘরে। দুদণ্ড বসো, জিরিয়ে নাও। একটু উত্তাপ সঞ্চয় করো। ছেলেটাকে দাও একবাটি গরম দুধ।'…

হঠাৎ ক্রিং ক্রিং ধ্বনি। ঘড়ির অ্যালার্ম বাজছে। ছুটে গিয়ে বন্ধ করে অপরাধীর গলায় সুমিতা বলল, 'ও ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ভোররাত্তিরে উঠে লিখত। আমি দুষ্টুমি করে সময়টা মাঝেমাঝে বাড়িয়ে দিতাম।'

সুবিনয় কখনো খুব বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কখনো খুব তরুণ। একটা মানুষের বয়সকে কি এরকম ইচ্ছে-মতো উলটিয়ে-পালটিয়ে নেওয়া যায়। ঠিক যেন সারি-সারি বয়সের আইস কিউব দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনো একটা নির্দিষ্ট কিউবের ওপর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে জমে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে হবে। পা ডুবে যাবে ওই কিউবের মধ্যে। দক্ষ খেলোয়াড়রা তাই দাঁড়িয়ে থাকে না। ছুটতে থাকে। সামনের দিকে কিংবা পিছনে। টপকে-টপকে পার হয়ে যায় বরফের ঘনকের দুরত্ব।

বাইরের দরজায় কারা যেন ব্যস্তভাবে ঘন-ঘন কলিংবেল বাজাচ্ছে। জলতরঙ্গের আওয়াজে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সমস্ত নিঃশব্দতা।

দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল সুমিতা। মাঝবয়েসী একজন ভদ্রমহিলা গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকলেন। হালকা নীল রঙের ছাপা শাড়ি। চুলের একপাশে রুপোলি অভ্র ঝিকমিক করছে। মুখে ব্যক্তিত্বের কাঠিন্য। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। মহিলার পিছু-পিছু একটি অল্পবয়েসী ছেলে। এবং সুমিতা।

মহিলাকে দেখেই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুবিনয়। যেন সম্মান দেখানোর জন্য।

মুখের ডৌলে খুব চেনা মানুষের আবছায়া উপস্থিতি। কত দিন পর দেখা। তবু তেমন অপরিচিত মনে হচ্ছে না। অবিনাশের বউ কৃষ্ণাকে চিনতে কষ্ট হল না সুবিনয়ের।

হাতদুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে সুবিনয় দ্বিধাজড়ানো গলায় বলল, 'বউদি, আপনি এসে গেছেন।'

কৃষ্ণার নীরব কঠিন দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে গেল সুবিনয়। তবু কিছু বলতে হয়, তাই বলল, 'আপনাদের বিয়ের পর একদিন আলাপ হয়েছিল। আমি সুবিনয়। অবিনাশের ছেলেবেলার বন্ধু।'

'আপনি এখানে আসেন নিয়মিত?' কৃষ্ণা শুকনো গলায় শুধাল।

'না—মানে, আজকে হঠাৎ…' সুবিনয় কিভাবে পুরো ঘটনাটা খুব দ্রুত গুছিয়ে বলবে ভেবে পেল না।

সুবিনয়ের দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে আর-কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ করল না কৃষ্ণা। অবিনাশের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। সামান্যক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভাবল। তারপর অনাবশ্যকভাবে বিছানার চাদরটা একটু টানটান করে দিল। মাথার বালিশটা সরিয়ে অদৃশ্য ধুলো ঝেড়ে আবার ঠিক করে সাজিয়ে দিল।

অবিনাশের গালে একটা মাছি বসেছিল। হাত নেড়ে তাড়িয়ে দিল। কিছু একটা চিন্তা করে কপালের ওপর হাতটা রেখে চুপচাপ অবিনাশের পাশে বসে থাকল কিছুক্ষণ।

তারপর কী মনে হতে অনুচ্চ স্বরে ছেলেটিকে ডাকল, 'জয়দেব, তুই বাজার থেকে কিছু ফুল আর ধূপ কিনে নিয়ে আয়। এর মধ্যে খোকন বউমাকে নিয়ে এসে যাবে নিশ্চয়ই।'

ছেলেটা বেরিয়ে যাবার আগে কৃষ্ণা মনে করিয়ে দিল, 'চাঁপাফুল পেলে বেশি করে কিনবি। ওর খুব প্রিয় ছিল। মৃতদেহর সঙ্গে রজনীগন্ধার স্টিক ওর দুচক্ষের বিষ ছিল।'

একটু আলাপ করার ভঙ্গিতে সুবিনয় বলল, 'অবিনাশের ছেলে কখন আসবে?'

উদাসীন ভঙ্গিতে কৃষ্ণা বলল, 'খোকন ঢাকুরিয়ায় ওর শ্বশুরবাড়িতে কালকে গেছে। বউমার বাবার শরীরটা ভালো নেই। ড. ঘোষের কাছে ফোনে জানতে পেরে খবর পাঠিয়েছি। এখুনি এসে যাবে।'

তারপর আর কেউ কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। সবাই চুপচাপ। অবিনাশের বিছানার একপাশে কৃষ্ণা। একটু দূরে চেয়ারে বসে সুবিনয়। ওপাশে বইয়ের আলমারির পাশে স্মৃতিহীন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে। সুমিতা।

সময় যেন কাটতে চাচ্ছিল না। জয়দেব নামে ছেলেটি বেরিয়ে যাওয়ার পর বাইরের দরজা খোলাই রয়ে গেছে। সুমিতা আর দরজা বন্ধ করতে যাওয়ার কথা ভুলে গেছে বলে মনে হয়।

অল্পবয়েসী দুজন যুবক-যুবতী ঢুকতেই ব্যাকুলকণ্ঠে কৃষ্ণা বলল, 'খোকন, এখন সব দায়িত্ব তোমার। বাপির শেষযাত্রায় যেন কোনো অমর্যাদা না হয়।'

মাথা নেড়ে খোকন বলল, 'প্রেসকে খবর দিয়েছি। টিভি, রেডিও থেকে লোক চলে আসছে। বাপির যে কজন বন্ধু, লেখক, কবি, আর্টিস্ট, এডিটার, পাবলিশারকে ফোনে পেয়েছি খবর দিয়েছি! এর তার মুখ থেকে খবর শিগগিরই সবাই পেয়ে যাবে।'

'মেজমামাকে ফোনে পেয়েছ?'

'না। তবে পল্টুকে পাঠিয়েছি। মেজমামা এসে গেলে আর চিন্তা নেই। হি ইজ আ মারভেলাস ম্যান।'

অবিনাশের পুত্রবধূ শাশুড়ির পাশটিতে গিয়ে বসল। পুতুলের মতো ভারি মিষ্টি নিষ্পাপ চোখমুখ। শোক কী জিনিস এখনো বোধহয় জীবনে তেমন টের পায় নি। কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপচাপ তাকিয়ে-তাকিয়ে চারিদিক দেখছে। সিলিং ফ্যান, চেয়ার, টেবিল, ফ্রিজ, বইয়ের আলমারি, টু-ইন-ওয়ান, সুমিতা। দৃষ্টিটা ওর কাছে পৌঁছনো মাত্র স্থির হয়ে গেল অবিনাশের পুত্রবধূর।

বউয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে সুমিতাকে বুঝি এতক্ষণে দেখতে পেল খোকন। বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় তার চোখমুখ উত্তেজিত হয়ে গেল। উষ্মা গোপন না রাখতে পেরে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওই মেয়েছেলেটা এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী করছে? চলে যায় নি কেন?'

'তার আমি কী বলব? আমি কি ওকে এখানে থাকতে বলেছি? খানিক বাদে নিশ্চয়ই চলে যাবে।' চিবিয়ে-চিবিয়ে কৃষ্ণা বলল।

'এখন নানারকম লোকজন আসবে। একটা স্ক্যানডালের গন্ধ পেলে প্রেস তো এখুনি একটা স্টোরি ফেঁদে বসবে।' অধৈর্য গলায় খোকন বলল।

'স্ক্যানডালের আর বাকি আছে কি?' ভুরু কুঁচকে কৃষ্ণা বিরক্তিপূর্ণ গলায় বলল।

'তুমি বুঝছ না, মা। ওই মেয়েটাকে দেখলে আমার মাথায় খুন চেপে যায়।'

'তুমি থামবে!' মৃদু কণ্ঠে খোকনের বউ বলল।

'আমি তোর মনের সব দুঃখ বুঝি খোকন। আমারও কম বড়ো অপমান! আত্মীয়স্বজন চেনাজানা কারোর সামনে মুখ দেখানোর উপায় ছিল না। বুড়ো বয়সে অমন জ্ঞানী-মানী মানুষের ভীমরতি হলে আমরা কী করব বল্ তো?' ধীরে-ধীরে খুব দুঃখিত গলায় কৃষ্ণা বলল।

'অনেক সহ্য করেছি, মা। আজ একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। সবকিছুরই একটা সীমা আছে।' খোকন বলল।

খোকনের হিংস্র ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা কেঁপে উঠল সুবিনয়ের। অবিনাশের মৃত নিঃশব্দ মুখের দিকেও চোখটা চলে গেল। কী বিচিত্র এই বেঁচে থাকা, সেই সঙ্গে শেকড়বাকড়ের মতো চারপাশে ছড়ানো মানুষজনের সঙ্গে জড়ানো সম্পর্কের টানা-পোড়েন···কে যে কখন মনের খুব কাছে চলে আসে, কে দূরে সরে যায়, হিসেব কষে কি তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়? সুবিনয় অন্যমনস্কভাবে ভাবতে চেষ্টা করে। এত কিছু বিচিত্র সমস্যা বড়ো জটিল ধাঁধার মতো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে যায়···

'বল তো ঘাড়ধাক্কা দিয়ে মাগীকে তোমার সামনে বাড়ি থেকে দূর করে দিচ্ছি···' খোকনের কথা শেষ হতে না হতেই বেশ কয়েকজন ভদ্রলোক এসে গেলেন লটবহরসমেত।

'আমরা টি-ভি থেকে এসেছি বউদি।' একগাল হেসে সামনের ভদ্রলোক বললেন।

'সমরবাবু না? কী বিভাগের যেন প্রোডিউসার আপনি?' অবিনাশের বউ তাঁর স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিতে চাইলেন বুঝি।

'সাহিত্য-সংস্কৃতি।' আর কথা না বাড়িয়ে সঙ্গের লোকজনকে নানারকম নির্দেশ দিতে থাকলেন সমরবাবু।

ধীরে-ধীরে আরো অনেক লোকজন আসতে থাকলেন। ফুল-হাতে। ক্যামেরা-হাতে। সকলেই কত ব্যস্ত অবিনাশকে নিয়ে।

ইতিমধ্যে পয়েণ্ট খুঁজে আলোর প্লাগ পরিয়েছে লাইটম্যান। চড়া হলুদ আলোতে ভরে গেছে ঘর। টি-ভির ক্যামেরাম্যান রেডি। অবি নাশের মাথার কাছে বসল তার সদ্যবিধবা স্ত্রী। সমরবাবু বললেন, 'বউদি, মাথার কাপড়টা একটু সরিয়ে দিন। আর একটু ক্লোজে বসুন।' ছেলে আর ছেলের বউ বাপের এপাশে ঠিকমতো পজিশান নিয়ে বসে পড়ল। সাক্ষাৎকারে উত্তর দিচ্ছে অবিনাশের বউ, '···উনি তো চিরকালই সাহিত্যের জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছিলেন। ···হ্যাঁ, আমাদের প্রেম করে বিয়ে। কত কথা কত স্মৃতি যে মনে পড়ে···সেবার আকাদেমি পেলেন···'

সুবিনয় বুঝতে পারল, সে খুব একা হয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে। বড়ো বেমানান। ধীরে-ধীরে সে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। আরো কত লোক আসছে। কত ফুল জমা হচ্ছে অবিনাশের চারপাশে। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ-চমকের মতো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

পেছন ফিরে ঘরভরতি ভিড়ের মধ্যে সুমিতাকে খুঁজল সুবিনয়। নজরে পড়ল দূরে বইয়ের আলমারির একপাশে চুপচাপ শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। অন্যমনস্কা। কী যেন ভাবছে। ভিড়ের মধ্যে ডাকতে গিয়ে সঙ্কোচ বোধ করল সুবিনয়। চোখা-চোখি হলে কিছু বলে আসা যেত। কিন্তু কীই বা বলা যেত? মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল সে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মনে হল, খানিকক্ষণ পরে তার মতো এভাবে একা-একা এই রাস্তা ধরে হেঁটে যাবে সুমিতা। ফিসফিস করে আনমনা উচ্চারণ করল সুবিনয়, 'আমায় ক্ষমা করো, মেয়ে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি।'

'মিথ্যে-মিথ্যে তুমি দুঃখ পাচ্ছ।'

'তুমি এখন কোথায় যাবে?'

'কী জানি।'

'আমি বুড়ো হয়ে গেছি, মেয়ে।'

'ফের এক কথা। কেউ বুড়ো হয় না।'

'তোমাকে একবারও বলতে পারলাম না—চলো, তোমাকে পৌঁছে দিই একটা ছোট্ট ঘরে। শান্তিতে উত্তাপে ভালোবাসায় দিন কাটবে তোমার।'

'কেন শুধু-শুধু তুমি দুঃখ পাচ্ছ। আমাকে তো এখন একা-একা পথ হাঁটতে হবে। এটাই যে নিয়ম। সেই যে একটা গোয়ালঘর আছে, গোরুরা শান্তিতে জাবর কাটছে, জমা আছে একরাশ হলুদ বিচালি, লতাগুল্মে ভরে আছে চতুর্দিক। একপাশে নদী আছে, নদীতে বালুচর আছে, বুনোফুলের জঙ্গল আছে। নদীর ওপারে আছে একটা বিশাল আদ্যিকালের বটগাছ। চারপাশে নিঃঝুম নির্জনতায় কান পাতলে শোনা যায় আকাশ থেকে শিশির পড়ার শব্দ। সেখানে আমি নিশ্চয়ই ঠাঁই খুঁজে পাব। একটা মানুষের জন্ম হবে। পৃথিবীর আলো দেখে কাঁদবে সেই শিশু সমস্ত নিস্তব্ধতা চুরমার করে···'

বিড়বিড় করে সুবিনয় বলে, 'দেখো, আমি ঠিক খুঁজে-খুঁজে পৌঁছে যাব সেই গোয়ালঘরে। আকাশের তারারা আমাকে পথ দেখাবে।'

মণ্টো : তিক্ত, বিষণ্ণ ভালোবাসা

কিরণশঙ্কর মৈত্র

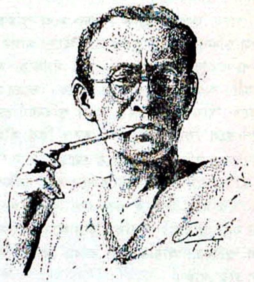

গল্প-সংকলনটির নাম "অঙ্গারে" (জ্বলন্ত কয়লা)। এই সংগ্রহে যেসব বিখ্যাত উরদু লেখকের কাহিনী সংকলিত হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন সাজ্জাদ জাহির আহমেদ আলি, রশিদ জেহান এবং মাহমুদজ্জাফর। উরদু সাহিত্যে প্রগতি-আন্দোলনের সূচনা বলা যেতে পারে ১৯৩২ সালের ডিসেমবর মাসে এই গল্পসংগ্রহটি প্রকাশের সঙ্গে। সাদাৎ হাসান মণ্টোর বয়স তখন মাত্র কুড়ি . বোমবে থেকে তখন তিনি "মুস্‌সাবের" (আর্টিস্ট, চিত্রকর) নামে একটি ফিল্ম-ম্যাগাজিনের সম্পাদনা করছেন।

উরদু সাহিত্যের দুনিয়ায় "অঙ্গারে" তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে। গ্রন্থটির বিরুদ্ধে কোনো উগ্র রাজনৈতিক মতবাদ বা অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয় নি। যে-বিষয়ের জন্যে বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় তা আরও গুরুতর—সংকলনটির মধ্যে ছিল প্রথাসিদ্ধ ধর্মবিশ্বাস, প্রচলিত বিবাহপ্রথা এবং সামাজিক বিধিনিষেধের প্রতি বিদ্রূপ আর কটাক্ষ।

সংগ্রহটির অন্যতম কথাকার আহমেদ আলির ভাষায়—"মোল্লা এবং পুরোহিতেরা গ্রন্থের সব লেখককে গালিগালাজ দিলেন। অনেক অর্ধ-রাজনৈতিক এবং সর্বভারতীয় দল সংকলনটির বিরুদ্ধে নিন্দা-প্রস্তাব অনুমোদন করল। তৎকালের ইউনাইটেড প্রোভিন্সের বিধানসভায় গ্রন্থটির নিষিদ্ধকরণ দাবি করা হল। "অঙ্গারে"র দিকে শুধু তাকিয়েই অনেকে মূর্ছা গেলেন এবং পুস্তকবিক্রেতারা তাঁদের কাছে দেওয়া "অঙ্গারে"র সমস্ত কপি ফেরত দিয়ে দিলেন। কিন্তু এত বাধানিষেধ আর নিন্দা-প্রস্তাব সত্ত্বেও "অঙ্গারে"র অন্তর্নিহিত আইডিয়া দাবানলের মতো সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। বহু ব্যক্তি ঘরের মধ্যে জানালা বন্ধ করে চুপিচুপি এই গল্পসংগ্রহের রসাস্বাদন করতে লাগল প্রকাশ্যে এর নিন্দা করার জন্যে।"

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে বইটি নিষিদ্ধ হল একটি সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত দেবার অভিযোগে। এই নিষিদ্ধকরণের ফলে নয়, বরং এই নিষিদ্ধকরণ সত্ত্বেও সমকালীন লেখকেরা গ্রন্থটিতে প্রকাশিত মুক্তচিন্তা দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হলেন। দু বছর পরে (১৯৩৪) প্রকাশিত হল আহমেদ আলির গল্পগ্রন্থ "শোলে" (আগুন)।

"অঙ্গারে" নিষিদ্ধ হবার পরে লখনৌ থেকে প্রকাশিত "লীডার" পত্রিকার ৫ এপ্রিল, ১৯৩৩ সংখ্যায় পূর্বোল্লিখিত চারজন লেখক গ্রন্থটির পক্ষে একটি বিবৃতিতে "লীগ অব প্রোগ্রেসিভ অথরস্"-নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মুক্ত সমালোচনা এবং মানবসমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, বিশেষ করে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার, স্বাধীন মতপ্রকাশের কেন্দ্র হবে এই সংস্থা। এই বিষয়ে লনডন থেকে অনুরূপ বিবৃতি প্রকাশ করলেন রাজা রাও, মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্, ইকবাল সিং এবং সাজ্জাদ জাহির।

উরদু সাহিত্যের দুনিয়ায় যখন এইসব ঘটনার আলোড়ন, প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, তখনও মুন্সী প্রেমচাঁদ এবং ড. মোহাম্মদ ইকবাল জীবিত। "প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠার মূলে প্রেমচাঁদের ভূমিকা যথেষ্ঠ। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ইকবালের "জাভেদনামা"। নিজ পুত্রের মাধ্যমে সারা বিশ্বের যুববর্গকে উদ্দেশ করে লেখা বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা।

১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত "প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনে"র অধিবেশনে সভাপতি প্রেমচাঁদ আপন বক্তব্যে বললেন—সৌন্দর্য এবং শক্তির উপাদান সাহিত্যে তখনই প্রকাশিত হবে যখন আমাদের (সাহিত্যিকদের) কাছে সৌন্দর্য প্রতিভাসিত হবে সার্বিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে। দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিকবোধে সাহিত্যিকরা কখনই পশ্চাদ্‌পদ নন, বরং প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই পথিকৃতের ভূমিকা নিয়ে জ্বলন্ত মশাল হাতে আগে-আগে পথ দেখিয়ে চলেন।

এই সময়ে উরদু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঘটল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—প্রকাশিত হল "হাতক" (অপমান) নামে একটি গল্প, লেখক—সাদাৎ হাসান মণ্টো। মণ্টোর বয়স তখন চব্বিশ।

প্রগতিশীল-ভাবধারা-সম্পৃক্ত মণ্টোর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প "হাতক"। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মণ্টো কখনও প্রগতিশীল শিবিরে শামিল হন নি। তিনি প্রগতিশীল লেখকদের লখনৌয়ের প্রথম অধিবেশনে যোগ দেন নি, যান নি হায়দ্রাবাদের পরবর্তী সমাবেশেও। বরং প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের প্রতি ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুক প্রকাশ পেয়েছে তাঁর "তারাক্কি পসন্দ্" গল্পে।

সৌগন্ধী নামে এক বেশ্যার কাহিনী "হাতক"। এক ধনী শেঠের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক হতচ্ছাড়া কুকুরকে নিয়ে সে শুতে যায়। সৌগন্ধী গণিকা হলেও তার হৃদয়ে রয়েছে মহান মানবিকতাবোধ—যা দালাল শঙ্করের মধ্যে অনুপস্থিত। প্রতিনিয়ত দেহবিক্রয় সত্ত্বেও সৌগন্ধীর মন মরে যায় নি, "ভালোবাসা"র উল্লেখেই তার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হয়—প্রত্যেক নতুন অথবা পুরানো, জানা কিংবা অজানা গ্রাহক তাকে বলেছে—"সৌগন্ধী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।" এ-কথা মিথ্যা জেনেও সৌগন্ধী নিজেকে এই মিথ্যার মোহে মোহিত হতে দিচ্ছে। "ভালোবাসা!" আঃ,

কী চমৎকার কথা!—সৌগন্ধী ভাবে। তার কাছে "ভালোবাসা" এক অনুপম প্রলেপ—সমস্ত শরীরে যা সে মাখতে চায়, যা তার সর্বদেহকে সুস্নিগ্ধ করে দেবে, সুমসৃণ করে দেবে। প্রতি লোমকূপের মধ্য দিয়ে এই সুস্মিত সুস্নিগ্ধতার সে আস্বাদন নিতে চায়, ভালোবাসার মায়াময় জগতে প্রবেশ করে সে সবকিছু ভুলে যেতে চায়। কখনও-কখনও ভালোবাসার আবেগে আপ্লুত হয়ে সে নিজেকে সংবৃত করতে অক্ষম হয়, তখন তার খদ্দেরকে সে শয্যায় শুইয়ে, অতি আদরে, তার মাথাটি কোলে তুলে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ভালোবাসার আবেগ তার মধ্যে এমনই প্রবল যে সেই অনুভূতির জোয়ারে সে তার নিশীথ-অতিথিকে অভিভূত করে দিতে পারে। তার ভালোবাসার অনুভব এমনই ব্যাপক যে একসঙ্গে এখন সে চারজন পুরুষকে ভালোবাসা দেয়। এই চারজন পুরুষের ফোটোগ্রাফই সে তার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। নিজের এই শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সে ভাবে—পুরুষমানুষের মধ্যেও এই শুভশক্তি কেন অনুপস্থিত? পুরুষমানুষের ব্যাপার-স্যাপার সে বুঝতে পারে না। একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে—'সৌগন্ধী, এই জগৎ তোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে নি।'

গণিকাকে মানবিক দৃষ্টিতে চিত্রণে মণ্টো উরদু সাহিত্যে পথিকৃৎ। এমন নয় যে তার আগে উরদু সাহিত্যে বেশ্যা-চরিত্র অঙ্কিত হয় নি, কিন্তু মণ্টোর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য অনায়াসবোধ্য। পূর্ববর্তী হাফিজ নাজির আহমেদের "হরিবালি" এক মূর্তিমতী পাপ, সমাজের আবর্জনা; কাজী আবদুল গফফরের "লায়লা" আবার অতিরিক্ত রোম্যানটিক। মির্জা মুহম্মদ হাদি রুসভার "উমরাও জান" তো উচ্চ কোটির সাহিত্য-সমালোচিকা যিনি মীর, মোমিন, জক এবং গালিবের রচনায়ও ত্রুটি খুঁজে বার করেন। আর মণ্টো-পরবর্তী সাহিত্যের বারবধূরা ড্রয়িংরুমের কলগার্ল যারা কম্যুনিজম এবং ক্যামু সম্বন্ধে অবাধে আলোচনা করেন।

পরিপূর্ণ মানবীরূপে বারাঙ্গনাদের চিত্রিত করতে চেয়েছেন মণ্টো। পূর্ব-উল্লিখিত "হাতক" গল্পের সৌগন্ধা যখন অত্যন্ত ক্লান্ত, ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে—তখন সে আবার এক দালালের সঙ্গিনী হয় নতুন খদ্দেরের খোঁজে। কারণ তার প্রতিবেশিনী এক দক্ষিণী গণিকাকে সে কথা দিয়েছে অর্থসাহায্যের। সেই গণিকার স্বামী থাকে মাদ্রাজে। সে মোটর অ্যাকসিডেনটে আহত হয়েছে। সেই গণিকার মাদ্রাজে ফিরে যাবার জন্যে ট্রেনের টিকেট কাটবার টাকাটা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সৌগন্ধী।

যাত্রা শুরু : বঞ্চনা, বেদনা, যন্ত্রণা

১৯১২ সালের ১২ মে পানজাবের হোসিয়ারপুর জেলার সামরালে মণ্টোর জন্ম এক সম্পন্ন পরিবারে। তাঁদের পরিবার মূলত কাশ্মীরের অধিবাসী, পরবর্তী কালে তাঁরা পানজাবে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন কঠোর প্রকৃতির লোক। মাতাপিতার শেষ সন্তান মণ্টো বালক বয়সে ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং কোমল প্রকৃতির। তাঁর দুই বড়ো সৎভাইকে উচ্চ-শিক্ষার জন্যে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মণ্টো শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও, বিদেশে কেন, ভারতেও উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পান নি। অমৃতসর থেকে কোনোভাবে ম্যাট্রিক পাশ করে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনটার সায়ানসে ভরতি হন, কিন্তু উচ্চশিক্ষালাভ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। আলিগড় থেকে তাঁকে দিল্লী আসতে হয়। দিল্লীতে এসে গল্প লেখার সঙ্গে-সঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদনা শুরু করেন তিনি। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করলেও তিনি ছিলেন মুখ্যত কথাকার, আর তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য বিষয় হল সেক্স্।

অনুবাদ-সাহিত্যের পথে মণ্টোর সাহিত্যজীবনের সূচনা। চেখভ, গোরকি, মোপাসাঁর কাহিনীকে তিনি উরদুতে রূপান্তরিত করেন। ভিকটর উগো, তলস্তয় আর গোরকির দ্বারা তিনি এত প্রভাবিত হয়েছিলেন যে নিজেকে তিনি "ক্রান্তিকারী" (বিপ্লবী) বলতেন।

অল ইনডিয়া রেডিয়োতে বহু সফল এবং আকর্ষণীয় নাটক লিখবার পরে তিনি বমবে চলে যান। সেখানে কিছুদিন পত্রিকার সম্পাদনা করেন, কয়েকটি ফিলমের কাহিনীও লেখেন—যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "আটদিন", "পুতলী", "মির্জা গালিব", "ঘমণ্ড্" (অহঙ্কারী)। 'আটদিন'-চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয়ও করেছিলেন।

বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে মণ্টো তিনশো ছোটগল্প, শতাধিক রেডিয়ো-নাটক-ফীচার, স্মৃতিচারণা এবং একটি উপন্যাস লিখেছেন। 'চাচা শামকে নাম পত্র' শীর্ষক নয়টি রাজনৈতিক ভাষ্যও লিখেছিলেন যার মধ্যে ছিল এশিয়া মহাদেশে আমেরিকার ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের কঠোর সমালোচনা।

অশ্লীলতার দায়ে ইংরেজ আমলে তিনবার এবং পাকিস্তানে চলে যাবার পরে তিনবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। প্রগতি-আন্দোলনের প্রভাব তাঁর রচনায় রূপায়িত হলেও প্রগতিবাদীরা তাঁকে তাড়না করেছেন। প্রাচীনপন্থীরা তাঁকে চিহ্নিত করেছেন অশ্লীল লেখক বলে, আধুনিকেরা লাল কমিউনিস্ট। চারিদিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে মণ্টোকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয় লাহোরের উন্মাদ আশ্রমে। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ১৯৫৫ সালের ১৮ই জানুয়ারি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ। "তোবা টেক সিং" গল্পের নায়ক বিষেণ সিং-এর স্রষ্টার মৃত্যুর হল আপন কাহিনীর চরিত্রের মতোই।

মিয়ানী সাহিব কবরখানায় ড. তাসির, বারি সাহিব আলীগ এবং আগা কস্হর কাশ্মীরীর পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

আজীবন লড়াই করে গেছেন মণ্টো—সমাজ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ—সবার বিরুদ্ধে। তাঁর এমন বন্ধু নেই যাকে তিনি ভৎর্সনা করেন নি, এমন প্রকাশক নেই যার সঙ্গে লড়াই করেন নি, এমন সহ-কর্মী নেই যাকে অপমান করেন নি। প্রচলিত সমাজ-রীতির বন্ধন তাঁকে বাঁধতে পারে নি। এক রহস্যময়ী পরমার সন্ধানে তাঁর চিত্ত ছিল সতত অস্থির অক্লান্ত অভিযাত্রী। তাঁর ভাষা ছিল তিক্ত আর তীক্ষ্ণ, মসী তীব্র আর বিষাক্ত। তাঁর স্টাইল ক্ষুরধার আর ক্ষমা-হীন। কিন্তু বাইরের এই তীক্ষ্ণ, তীক্ত বিষময়তার অন্তরালে তাঁর ভিতরে ছিল অন্তঃসলিল ভালোবাসার ফল্গুধারা। জগৎ আর জীবন মণ্টোর প্রতি অবিচার করলেও ইতিহাসের কাছে তিনি সুবিচার পাবেন বলেই আশা করা যায়।

উজ্জ্বল কথাকার

"নয়া কানুন"কে মণ্টোর একটি শ্রেষ্ঠগল্প বলে গণ্য করা হয়। কাহিনীটি 'গভর্নমেণ্ট অব ইনডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫'-এর পশ্চাৎপটে।

ঘোড়ার গাড়ির কোচোওয়ান মঙ্গু একজন ইংরেজের উপরে প্রতিশোধ নেয়—যার হাতে সে আগে প্রহৃত হয়েছিল। মঙ্গু ভেবেছিল—নয়া আইনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষার এক নতুন অধ্যায় শুরু হবে। কিন্তু মঙ্গু ভুল করেছিল—কিছুই নতুন নয়। আইন একই রকম রয়েছে।

এই ধরনের রাজনৈতিক গল্প অবশ্য বেশি লেখেন নি মণ্টো। প্রাক-জীবন উপান্তে তিনি লিখেছিলেন আর-একটি অবিস্মরণীয় কাহিনী "তোবা টেক সিং"।

দেশবিভাগের পরে ভারত আর পাকিস্তানের উন্মাদ-আশ্রমে বাসকারী পাগলদের নিজ-নিজ দেশে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। পাকিস্তানের পাগলা গারদে ছিল বিষেণ সিং। ভারত আর

পাকিস্তানের উন্মাদদের যখন ভাগাভাগি হচ্ছিল তখন সে সবাইকে জিজ্ঞেস করছিল—কোথায় তার গ্রাম তোবা টেক সিং, ভারত অথবা পাকিস্তানে? লাহোর পাগলা গারদের অধিকাংশ মানসিক রোগীরা অন্য কোথাও যেতে চায় নি, কারণ তারা বুঝতেই পারছিল না—কেন তাদের এক অজানা জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যারা ব্যাপারটা খানিকটা বুঝেছে—তারা হয় ভারত অথবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে। কোথাও দুটি দলের মধ্যে হচ্ছে মারামারি। দু-তিনটি মারাত্মক সংঘর্ষ কোনো-ক্রমে এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তারপর এল বিষেণ সিংয়ের পালা, দুই দেশের অফিসাররা যখন বিধিবদ্ধ কাজকর্ম করছিলেন—তখন সে জিজ্ঞেস করল—'তোবা টেক সিং গ্রাম কোথায় ?' একজন অফিসার শুকনো হেসে বললেন—'পাকিস্তানে।' বিষেণ সিং এত দিন ধরে যে-উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিল পেয়ে গিয়ে ভারতের জমি থেকে সরে গিয়ে পাকিস্তান সীমান্তের দিকে গেল। কিন্তু সেখানকার প্রহরী আবার তাকে ঠেলে দিল ভারত-সীমানায়। 'আমি ওদিকে যাব না'—সে চিৎকার করে উঠল। তারপর অস্ফুটে উচ্চারণ করতে লাগল পাগলের অবোধ্য ভাষা। কোনোরকমেই তাকে বোঝানো গেল না। বাধ্য হয়ে অফিসাররা তাকে উপেক্ষা করে গেলেন। তখন সে দুই সীমানার মাঝখানে গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অফিসাররা তার কাজে বাধা দিলেন না। কারণ বিষেণ সিং এক পাগল বই তো আর কিছুই নয়, সে তো কারোর ক্ষতি করে না।

তারপর ভোরের আগে সবাইয়ের কানে গেল বিষেণ সিংয়ের গগনভেদী জান্তব চিৎকার। সীমান্তের দুদিক থেকেই অফিসাররা তার দিকে ছুটে গিয়ে দেখলেন—বিষেণ সিং ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছে। দুই দিকেই কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে ভারত আর পাকিস্তান, আর তার মাঝখানে 'নো ম্যানস ল্যানড'-এর মধ্যে বিষেণ সিংয়ের সাধের 'তোবা টেক সিং গ্রাম।'

বিংশ শতাব্দীর এক তীব্র রাজনৈতিক গল্প "তোবা টেক সিং।" যে-উপমহাদেশের জনসাধারণ একই ভাষা-সংস্কৃতি-রীতি-নীতিতে আবদ্ধ তাদের মধ্যে দেশবিভাগের কৃত্রিম ভেদরেখার দিকে এই কাহিনী অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

মণ্টোর কাহিনী নিয়ে উরদু সাহিত্যের জগতে তীব্র মতভেদ। সাজ্জাদ জাহির বলেছেন—'সাদাৎ হাসান মণ্টো উরদু সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ কথাকার। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি—উরদু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাহিনীর মধ্যে রয়েছে তাঁর রচনা।'

উরদু কবি সর্দার জাফরি মণ্টোকে অশ্লীল সাহিত্যিক বলেও তাঁকে শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা দিয়েছেন। একটি চিঠিতে তিনি মণ্টোকে লিখেছিলেন—'তুমি জানো—তোমার এবং আমার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বহু ফারাক। কিন্তু তা হলেও তোমাকে আমি সম্মান দিই এবং তোমার লেখনী থেকে অনেক কিছু আশা করি।'

মণ্টোর গল্প-সংগ্রহ "যুগদ্"-এর ভূমিকায় জাফরি লিখেছেন—'উরদু-সাহিত্যে মণ্টো সবচেয়ে নিন্দিত কথাকার। কিন্তু তাহলেও তাঁর যে-খ্যাতি মিলেছে তা দুর্লভ। এই প্রসিদ্ধির জন্যে প্রতিভার দরকার, আর সেই প্রতিভা মণ্টোর রয়েছে—যা তাঁর কলমের নিবে দামি মুক্তোর মতো দ্যুতিময়।'

সমাজের উঁচুতলার লোকেরা যেসব দুর্বল মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় সেইসব নিপীড়িত, শোষিত সাধারণ চরিত্রগুলি ঠাই পেয়েছে মণ্টোর কাহিনীতে। টাঙ্গাওয়ালা, বাদামওয়ালা, দালাল, বেশ্যা ইত্যাদি সবাই মণ্টোর চরিত্র। তারা ভালো অথবা মন্দ, তা মণ্টোর বিচার্য নয়। তাদের শোধরানো সম্ভব কিনা—সে-প্রশ্নও তিনি উত্থাপন করেন নি। মণ্টো শুধু দেখিয়েছেন—এরা সবাই রক্তমাংসের মানুষ। ভালো হবার সম্ভাবনা এদের মধ্যে ছিল, কিন্তু চারপাশের সমাজই এদের পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। মণ্টোর লেখনী শুধু ক্যামেরার মতো এদের বিশ্বস্ত আর বাস্তব ছবি চিত্রিত করে গেছে।

বেশ্যা কি শুধুই দেহ-পশারিণী ?

মণ্টোর কাহিনীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে বিভিন্ন ধরনের বারাঙ্গনা-চরিত্র। এই চরিত্রায়ণ তিনি করেছেন সতর্কতা আর কল্পনাশৈলীর সঙ্গে। শুধু পারিপার্শ্বিকতার দিকেই তিনি দৃষ্টি রাখেন নি যা বহু মেয়েকে পতিতাবৃত্তিতে তাড়িত করে। কিভাবে এই হতভাগিনীরা সমাজে নিপীড়িত হয়—সেই বঞ্চনার কাহিনীও তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট। গণিকা-জীবনের গভীরে অবগাহন করে তিনি দেখেছেন যে তারা অনুদ্ধারণীয় নয়, যথোচিত যত্নের সঙ্গে আবার তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

"শান্তি" গল্পের নায়িকা পুরুষের ভোগলিপ্সার শিকার হয়ে গর্ভবতী হয়। লজ্জা-অপমানবোধে গৃহত্যাগ করে সে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে। রেস্তোরাঁয় সে খদ্দের খুঁজে বেড়াত এবং ক্রমে সে সম্পূর্ণ আবেগহীনভাবে নিজের পেশায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তারপর একদিন তার এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়—যে তার দেহ ভোগ করতে চায় না, চায় তার সঙ্গে শুধু কথাবার্তা বলতে এবং সেজন্যে তার দামও দিতে চায়। শান্তির জীবনে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। সেই ব্যক্তির প্রস্তাবে সে রাজি হয়, কিন্তু তার দেওয়া টাকা ফেরত দেয়। প্রথম সাক্ষাতের পরেও তাদের দেখাশোনা চলতে থাকে। সেই ব্যক্তি শান্তিকে তার আবাসস্থলে নিয়ে যেতে চায়—যা তার পেশার বিরোধী। শান্তির মনে হয়—এই ব্যক্তির কাছে হয়তো তার দেহ আকর্ষণীয় নয়, তাই সে অন্য মেয়ের সঙ্গে সেই লোকটির পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। কিন্তু সে অবাক হয়ে যায় যখন তার সেই প্রস্তাব লোকটি অস্বীকার করে। এমন লোক জীবনে কখনও দেখে নি শান্তি। অবশেষে সে তার দেহ-ব্যবসায় ছেড়ে দেয় সেই ব্যক্তির স্নেহ-ভালোবাসার পবিত্র প্রভাবে।

অশ্লীলতার দায়ে "কালী সালওয়ার"কে আদালত-এর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। মণ্টো অবশ্য এই অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

"কালী সালওয়ারে"র সুলতানা ব্রিটিশ ক্যানটনমেনটে ইংরেজ সৈন্যদের কামপিপাসা মেটাবার এক সাধারণ বেশ্যা মাত্র। ভাগ্যতাড়িতা হয়ে সে দিল্লীতে আসে। কিন্তু সেখানেও তার দুর্ভাগ্যের শেষ হয় না। রাজধানী দিল্লীতে তার তিনমাস থাকার সময় কোনো ইংরেজ অতিথি তার কাছে আসে নি, এসেছে মাত্র ছ জন সাধারণ খদ্দের এবং উপার্জন করেছে মাত্র সাড়ে আঠারো টাকা। ওদিকে মহরম এগিয়ে আসে, এই উপলক্ষে পরবার মতো তার কোনো কালো রঙের পোশাক নেই। কোনোরকমে সে একটি কুরতা আর দুপাট্টা (ওড়না) জোগাড় করে, কিন্তু তখনও তার সালওয়ার বাকি। সে জানে না—কিভাবে সালওয়ার সংগ্রহ করবে সে। অভাবের তাড়নায় হাতের সোনার চুড়িগুলি একটি-একটি করে খুইয়েছে সে। এখন একটি পয়সাও তার হাতে নেই। তাকে ছেড়ে চলে গেছে তার সঙ্গী খুদা বক্স্। বেশ্যাপল্লীতে সে একেবারে একা। তার আস্তানা রেলোয়ে শেডের সামনে। ব্যালকনি থেকে বাইরের দৃশ্য দেখে সে—ইয়ার্ডে ইনজিনের নাকমুখ থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে। বাষ্প বার হয়ে আসে ধকে-ধকে, কখনও কখনও চোখে পড়ে ইনজিনের ধাক্কায় বেরিয়ে-আসা একটি-মাত্র নিঃসঙ্গ ওয়াগন। সুলতানার নিজেকেও মনে হয়—ইনজিনের ধাক্কায় রেল-ট্রাকে বেরিয়ে-আসা ঐ একক ওয়াগনটির মতো—সে জানে না কোথায় তার গন্তব্য। একদিন ওই ওয়াগনটির মতো তারও গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। সে একা-একা অসংখ্য রেললাইনের মধ্যে দিশাহারা ওয়াগনগুলির দিকে তাকায়—তার জীবনও তো অন্ধ অলিগলির গোলকধাঁধায় দিশাহীন। কখনও তার মনে হয়—রেলোয়ে

শেডটি বেশ্যাখানা আর বাষ্প-ধূমায়িত ইনজিনগুলি বড়োলোক খদ্দেরদের মতো—যেসব শেঠেরা তার কাছে আসত আম্বালার ক্যানটনমেনটে।

সুলতানাকে মহরমের দিন সকালে একটি কালো সালোয়ার এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় শঙ্কর। কিন্তু নিয়ে যায় তার কানের রিঙ দুটি। এরপরে অবিশ্যি সুলতানা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে শঙ্করের প্রতিশ্রুতি পালনের উপরে। কিন্তু মহরমের দিন সকাল আটটায় তার দরজায় ধাক্কা পড়ে, দরজা খুলে সে দেখে—শঙ্কর দাঁড়িয়ে, হাতে খবরের কাগজে জড়ানো একটি প্যাকেট—'এই তোমার কালো সালোয়ার, পরে দেখো, একটু বড়ো হতে পারে।'—আর কোনো কথা না-বলে শঙ্কর চলে যায়। শঙ্করের চুল এলোমেলো, প্যানট কোঁচকানো। দেখে মনে হয়েছিল—কোনো নিশীথচারিণীর শয্যা থেকে সে এইমাত্র উঠে এসেছিল। শঙ্করের প্রতিশ্রুতিতে অবিশ্বাস করায় সুলতানার মনে এখন দুঃখ হল। এরপরে মণ্টো তার কাহিনী শেষ করেছেন এইভাবে—কামিজ আর দুপাট্টা সে লনড্রি থেকে কালো রঙ ক'রে আনল বিকেলে। তারপর যখন সালোয়ার, কামিজ আর দুপাট্টা—তিনটিই পরে নিল তখন তার দরজায় ধাক্কা। দরজা খুলে দেখে—তার প্রতিবেশিনী মুখতার দাঁড়িয়ে।

মুখতার ঘরের মধ্যে ঢুকে তীক্ষ্ণ চোখে তার কালো রঙের সালোয়ার-কামিজ-দুপাট্টার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কামিজ আর দুপাট্টা মনে হয় কালো রঙে ছুপিয়ে নিয়েছিস, কিন্তু সালোয়ারটা নতুন। কবে বানালি?'

'দর্জি আজই দিয়ে গেল—' সুলতানা জবাব দিল, তারপর তার চোখ পড়ল মুখতারের কানের দিকে—'তুই এই কানের রিঙ কোথা পেলি?'

"লাইসেনস"-গল্পে টোঙ্গাচালক আবু মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী যুবতী নৈতি টোঙ্গা চালাতে শুরু করল জীবিকানির্বাহের জন্যে। একদিন মিউনিসিপ্যাল কমিটি অফিসে তাকে জানিয়ে দেওয়া হল যে সে মহিলা হয়ে টোঙ্গা চালাতে পারে না। তাই তার লাইসেনস বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অফিসারের কাছে নৈতি প্রবল প্রতিবাদ জানায়—'কেন আমি টোঙ্গা চালাতে পারব না? মেয়েরা চরকায় সুতো কাটছে, মজুরনি হয়ে মাথায় ভারি বোঝ্ ওঠাচ্ছে, রেলোয়ে স্টেশনে কয়লার বস্তা ওঠাচ্ছে। আমি কেন টোঙ্গা চালাতে পারব না? আর কোনো কাজ আমি জানি না। এই টোঙ্গা আমার গুজরে যাওয়া আদমির। এই টোঙ্গা না-চালালে আমি পয়সা কামাব কী ক'রে? আমার উপরে রহম (দয়া) করো সা'ব। মুখের রুটি ছিনিয়ে নিয়ো না। টোঙ্গা না-চালালে আমি কী করব?'

নৈতির করুণ মিনতির জবাবে একটি নির্দয় উত্তর এল—'যা, পাড়ায় গিয়ে নাম লেখা। কোঠিতে বসলে অনেক পয়সা কামাতে পারবি।'

'ঠিক আছে—' স্তম্ভিত নৈতির মুখ থেকে আর বাকস্ফূরণ হল না।

ঘরে ফিরেই ঘোড়া আর টোঙ্গা বিক্রি করে দিল সে। তারপরে গেল আবুর সমাধিস্থলে। ভেজা চোখ-মুখে যাবার আগে সে বলল,—'আব্বু, তোমার নৈতির কাল মৃত্যু হয়েছে মিউনিসিপ্যাল কমিটির অফিসে—'

পরের দিন সে বেশ্যাবৃত্তি করার জন্যে লাইসেনসের আবেদন করল। এবং ত্বরায় তা পেয়েও গেল।

গণিকা এবং গণিকাবৃত্তি নিয়ে মণ্টোর রচিত কাহিনীগুলিতে বৈচিত্র্যের সমাবেশ। "হামিদ কা বাচ্চা" একটি অন্য ধরনের গল্প।

হামিদ একটি বেশ্যার কাছে যেতে শুরু ক'রে তাকে খুব পছন্দ ক'রে ফেলে। মেয়েটি গর্ভবতী হলে হামিদ জিজ্ঞাসা করে—গর্ভস্থ সন্তানের পিতা সে কিনা। লতা উত্তর দেয়—সে জানে না। হামিদ সময়ের হিসেব করে নিশ্চিত হয় যে—সে-ই জনক। সে নানা ধরনের ঔষধ আর মলম ব্যবহার করতে দেয় ভ্রূণটিকে নষ্ট করে দেবার জন্যে। কিন্তু কোনো কিছুতেই ফল হয় না। হামিদ ভেবে শিউরে ওঠে যে—কন্যাসন্তানের জন্ম হলে সে-ও তো মায়ের পেশাই গ্রহণ করবে। হামিদ নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করে, লতাকে ঘৃণা করতে থাকে, যে-বন্ধু তাকে বেশ্যাপল্লীতে নিয়ে এসেছিল তাকে ঘৃণা করতে থাকে। তারপরে সে ঠিক করে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই তাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করবে সে। করিম নামে এক পেশাদার খুনিকে সে ভাড়া করল এক হাজার টাকার বিনিময়ে নবজাত শিশুকে মেরে ফেলার জন্যে। করিম তাকে বলল যে—শিশুটি জন্ম নেবার পরেই তার কাছে সে এনে দেবে মাত্র, নবজাত শিশুকে সে মেরে ফেলতে পারবে না। অন্য কোনো উপায় না-থাকায় হামিদ তাতেই রাজি। সে ভাবল—শিশুকে নিয়ে ট্রেন লাইনে রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

এই কথা ভেবে সে লতার গ্রামে গেল যেখানে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল করিমের সঙ্গে সন্তান-প্রসবের জন্যে। সেখানে গিয়ে সে জানতে পারল যে পনেরো দিন আগেই একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে লতা। দাদা করিমকে সে বলে—মধ্যরাত্রিতে শিশুটিকে তার কাছে নিয়ে আসবার জন্যে।

অপেক্ষারত হামিদ আক্রান্ত হয় এক আত্যন্তিক মানসিক যন্ত্রণায়। তার সামনে চোখে পড়ে একখণ্ড পাথর, সে সিদ্ধান্ত নেয় ওই পাথর দিয়ে নিজেই সে নবজাত সন্তানকে হত্যা করবে। সহসা পায়ের শব্দ শোনা যায়। অন্ধকারে করিমের ছায়ামূর্তির আবির্ভাব, হাতে তার একটি ছোটো কাপড়ের পুঁটলি—'এই নাও তোমার বাচ্চা। এবারে আমার কাম খতম। আমি কাটলাম।'

বাচ্চাটি পুঁটলির মধ্যে তার হাত-পা ছুঁড়ছিল। হামিদ সেদিকে তাকিয়ে কাঁপতে শুরু করে। পুঁটলিটি মেঝেতে রেখে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে সে। তারপর পাথরটি তুলে বাচ্চাটির মাথা খোঁজে। হঠাৎ তার শিশুটিকে দেখবার ইচ্ছে জাগে। একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালায়, কিন্তু পুঁটলি খুলতে সাহস পায় না। হাতের দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যায়। আরেকটি কাঠি জ্বালিয়ে, মনকে দৃঢ় করে পুঁটলিটি খোলে। শিশুর মুখের দিকে তাকায়। পরিচিত মুখের আদল। তার মনে হয়—আগে এই মুখ যেন কোথায় দেখেছে। হাতের কাঠি আবার নিভে যায়। আবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে শিশুর মুখের দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে থাকে সে। হঠাৎ বুঝতে পারে সে—এ মুখে তো লতার আদল…

মণ্টোর এই কাহিনীগুলি শুধু বিষয়-বৈচিত্র্যে বা রূপকল্পেই অভিনব নয়—তাঁর কলানৈপুণ্যের পরিচয় পরিবেশ-নির্মাণ, মানবিক দৌর্বল্য উদ্‌ঘাটন, বিবেক-বুদ্ধি জাগরণের বর্ণনা-শৈলীতেও।

মণ্টোর বারাঙ্গনা-চরিত্র-চিত্রণ শরৎচন্দ্রকে স্মরণ করায়। পদস্খলিতা নারীদের প্রতি দুজনারই ছিল অপরিসীম সহানুভূতি। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেখানে ছিলেন মূলত প্রথাসিদ্ধ লেখক, মণ্টো সেখানে প্রকৃত অর্থেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কথাকার। মণ্টোর গণিকা-চরিত্রের সঙ্গে বরং অধিকতর মিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের বা সমরেশ বসুর কাহিনীর অনুরূপ চরিত্রের।

মণ্টোর কাহিনীতে বেশ্যাচরিত্র একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। এই গল্পগুলির জন্যে তিনি শুধু সমাজে ধিক্কৃতই হন নি—তাঁকে একাধিকবার আদালতের কাঠগড়াতেও দাঁড়াতে হয়েছিল। পতিতাদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—বেশ্যার উপরে যদি কাহিনী রচনা বন্ধ করতে হয়—তা হলে তার আগে বন্ধ করা উচিত পতিতালয়। তিনি লিখেছেন—'বেশ্যালয় এক কবরখানা—যাকে সমাজ আপন কাঁধে তুলে নিয়েছে। সমাজ যতক্ষণ পর্যন্ত এই লাশকে দাফন না-করবে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা এর চর্চা করতেই থাকবে। এই শবদেহ গলিত, দুর্গন্ধযুক্ত, ঘৃণ্য, ভয়ানক—যা-ই হোক না কেন, এর মুখ দেখতে ক্ষতি কী? এই শব কি আমাদের কেউ নয়? আমাদেরই কারোর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নয়? আমরা কখনও-কখনও এই শবদেহের

মুখ দেখব এবং অন্যদেরও দেখাব।'

মণ্টো কি অশ্লীল ?

সৌন্দর্য আর যন্ত্রণার কথা বললে যেখানে অশ্লালতা আসতেই পারে না, সেই অভিযোগে মণ্টোকে ছয় বার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে "বু", "কালা সালওয়ার" ও "ধুঁয়া" গল্পের জন্যে তিনবার এবং পাকিস্তানে "খোল দো", "ঠাণ্ডা গোস্ত্" ও "উপর-নীচে আউর দরসাইনী" গল্পের জন্যে আরও তিনবার তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রতিবারই এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আবেদন করে তিনি মুক্তিলাভ করেছেন।

তাঁর কাহিনীর অশ্লীলতার অভিযোগ সম্বন্ধে মণ্টো লিখেছিলেন—'আজ আমরা যে-যুগে বাস করছি সে-সম্বন্ধে যদি আপনারা সচেতন না-থাকেন তো আমার কাহিনী পড়ুন। যদি আপনি সেই কাহিনীকে সহ্য করতে না-পারেন তো তার কারণ—এই যুগটাই অসহ্য। আমার মধ্যে যে-খারাপ জিনিসগুলি রয়েছে—তা এই যুগেরই জনজাল। আমার লিখনশৈলীতে কোনো ক্রটি নেই, দোষ আমাদের এই সময়েরই।

'আমি হাঙ্গামা সৃষ্টি করার লোক নই। আমি লোকের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাই না। আমি সমাজ-সংস্কৃতির 'চোলি' (বক্ষোবাস) কি খুলে দেব, এই সমাজই তো হচ্ছে উলঙ্গ! আমি তাকে কাপড় পরাবার চেষ্টা করি না, কারণ সেটা দরজির কাজ।

'লোকেরা আমাকে উত্তেজক লেখক বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি বাস্তববাদী লেখক, কোনো বিষয়ের উপরে আমি আমি রঙ চড়াই না। এটা হচ্ছে আমার লেখার ভঙ্গি, স্টাইল। একে অশ্লীল, প্রগতিশীল, ঈশ্বরবাদী—যা খুশি বলা যায়। সাদাৎ হাসান মণ্টো, কাউকে, এমন-কি, ঠিকভাবে গালিও দেয় না।

"বু" (গন্ধ) গল্পটিকে অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্তি দিয়ে ১৯৪১ সালে লাহোরের অ্যাডিশনাল সেসন জজ এম. আর. ভাটিয়া অনেকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন—

'এটা অবশ্যই বিবেচনাযোগ্য যে—কয়েকজন বিখ্যাত উরদু সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবী লেখকের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এদের অন্যতম হলেন খান আবদুল রহমান চুঘতাই, অধ্যাপক কে. এল. কাপুর (ডি. এ. ভি. কলেজ), রাজিন্দর সিং বেদী, ড. আই. লতিফ, প্রফেসর, এফ. সি. কলেজ। এঁরা সবাই বলেছেন—"বু" গল্পের মধ্যে এমন কিছু নেই যা কাম অথবা কামভাবনা উত্তেজিত করে। বরং অন্যপক্ষে এইসব সুধী ও বিদ্বজ্জন দৃঢ়মত পোষণ করেন যে—এই গল্পটি প্রগতিশীল সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ দান। উরদু সাহিত্যের অঙ্গনে এটি একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে যা আধুনিকতম সাহিত্যধারাকে সূচিত করে। অভিযোগকারীদের চার নম্বর সাক্ষী স্বীকার করেছেন যে গল্পটি মানুষের নৈতিকতাকে দূষিত করে না।

'নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক আমাদের যুবমানসে অবৈধ আনন্দ ভোগের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখে দুঃখবোধ করেছেন এবং বিমর্ষ হয়েছেন প্রাচীন সংস্কৃতি ও নৈতিকতাবোধের অবনয়নে। নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক সেইসব গুণের তালিকাও দিয়েছেন যার জন্য আমাদের দেশ বিখ্যাত এবং বলেছেন নতুন ফ্যাশনের অবসান ঘটাবার কথা-ও।

'নিম্ন আদালতের মতবাদ প্রগতিশীল বলে মনে হয় না। দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। সৌন্দর্যের বিষয়বস্তু শাশ্বত আনন্দের আধার। যে কোনো কলাবস্তু সমাদরযোগ্য, তা চিত্র বা ভাস্কর্য যেরূপেই হোক না কেন। সমাজের কাছে ললিতকলাও একটি আদর্শ, তা নারীবিরোধী বা যৌনবিরোধী যা-ই হোক না কেন। লিখিত সাহিত্য সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

'দেশের বরেণ্য সাহিত্যিক আর শিল্পীরা যখন অভিযুক্তকে সমর্থন করেছেন—তখনই এই বিষয়টির মীমাংসা হয়ে গেছে। লেখকের কাহিনীটির দোষক্রটি আদালতে আলোচনার যোগ্য নয়। ফলে অভিযুক্তের আবেদন গ্রহণে আমার কোনো দ্বিধা নেই। অভিযুক্ত যদি কোনো জরিমানা দিয়ে থাকেন—তা তাঁকে ফেরত দিয়ে দেওয়া উচিত। আমি তাঁকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলাম।'

"ঠাণ্ডা গোস্ত্" কাহিনীর বিরুদ্ধেও অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই গল্পটির জন্যেও মণ্টোকে দাঁড়াতে হয়েছে আদালতের কাঠগড়ায়। তাঁর রচনার পক্ষে মণ্টোর প্রধান যুক্তি ছিল—অশিক্ষিত, রুক্ষ, বর্বর চরিত্রের মুখে তিনি সুসভ্য ও সুসংস্কৃত সংলাপ প্রয়োগ করতে পারেন না। ঔপন্যাসিক এরিস্কাইন ক্লাডওয়েলকে তাঁর 'গডস লিট্‌ল্ অ্যাক্টর' গ্রন্থের অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্তি দিতে গিয়ে এই কথাই বলেছিলেন আমেরিকার আদালত—'লেখকের কর্তব্য হল বাস্তবচিত্রণ। কিছু কাল্পনিক বস্তুর মিশেল তার সঙ্গে ঘটবেই। সাহিত্যসৃষ্টি বাস্তবের অবিকল কারবন-কপি হতে পারে না। সাহিত্যিককে বাস্তববাদী হতে হবে, কিন্তু তা ক্যামেরার বা খালি চোখে দৃষ্ট বস্তুর মতো নয়। এবং বাস্তব সাহিত্য হবে বাস্তবতার মতোই। নিঃসন্দেহে বিতর্কিত কাহিনীর চরিত্রের মুখের ভাষা কর্কশ এবং নোংরা। কিন্তু এই আদালত লেখকের কাছে তাঁর অশিক্ষিত, বর্বর চরিত্রের মুখে সুন্দরশোভন ভাষা দাবি করতে পারে না।'

অশ্লীলতার অভিযোগ খণ্ডন করে মণ্টো বলেছিলেন—'"ঠাণ্ডা গোস্ত্"-এ সত্যের চিত্রায়ণ। এর মধ্যে কোনো বিভ্রম নেই। এটি একেবারে বাস্তব এবং বলবার ভঙ্গি সিধা। যৌনতা ও মানসিক বাস্তবতা রূপায়িত গল্পটিতে। যদি এর মধ্যে নোংরা, কদর্য কিছু থাকে তবে তা কাহিনীর চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত—লেখকের সঙ্গে নয়। যদি গল্পের এখানওখান থেকে কিছু শব্দ বা বাক্য অপ্রাসঙ্গিকভাবে তুলে নিয়ে একে অশ্লীল বলা হয় তাহলে সেটা যথার্থ মূল্যায়ন হবে না। প্রকৃতপক্ষে, যদি গালিব, মীর, অ্যারিস্টোফেনিস, বোক্কাচিও, এমন-কি পবিত্র বাইবেল থেকেও ইতস্তত শব্দ তুলে নেওয়া হয়—তাও আপত্তিজনক মনে হবে। কোনো রচনাকে ঠিকভাবে বিচার করার জন্যে সামগ্রিকভাবে, পূর্ণদৃষ্টিতে, সর্বতোভাবে তার মূল্যায়ন করা উচিত।

'সবশেষে আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই যে—কোনো সাহিত্যগত ক্রটির অভিযোগে আমার "ঠাণ্ডা গোস্ত্"-কে অভিযুক্ত করা হয় নি। যদি তাই হত তো আমি খুশি হতাম। লিখনশৈলী, বর্ণনা বা কাহিনীগত ক্রটির কথা উল্লেখ করলে সাহিত্যিক হিসেবে আমার লাভ হত। কিন্তু আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি—কাহিনীর মাধ্যমে যৌন প্রবৃত্তি এবং ভাবনা জাগ্রত করার অভিযোগে আমি অভিযুক্ত। আমি শুধুমাত্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারি। এটি বিস্ময়ের কথা—"ঠাণ্ডা গোস্ত্"-এর কাহিনী কামভাব জাগাতে পারে, বরং এই কাহিনীর লোকের মনে উদ্রেক করা উচিত ভয় আর ঘৃণা, কাম বা যৌনপ্রেরণা নয়।'

"ঠাণ্ডা গোস্ত্"-এ দুই প্রধান চরিত্র ইশর সিং এবং কুলবন্ত কাউর প্রণিধানযোগ্য। এরা দুজনেই একদম গ্রাম্য, দুজনেরই কামশক্তি অতি প্রবল। কামপ্রবল ইশর শিং আনন্দ পেতে পারে কেবলমাত্র কুলবন্তের মতো শক্তিময়ী কামিনীর সহবাসে। অপরপক্ষে, কুলবন্তের সম্বন্ধেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। তারা দুজনেই দুজনার জন্যে ("মেড ফর ঈচ আদার") এবং তাদের যুগ্ম-জীবন অতি আনন্দে বয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন কুলবন্ত আবিষ্কার করল যে তার প্রতি ইশর সিংয়ের মনোভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তার সঙ্গে মিলনে ইশর সিংয়ের আগের সেই উত্তাপ আর আবেগ নেই। কুলবন্তের বিশ্বাস—এর একটিমাত্রই কারণ—ইশর সিংয়ের জীবনে অন্য স্ত্রীলোকের আবির্ভাব। আসলে কিন্তু ইশর সিংয়ের মধ্যে এক

ধরনের শারীরিক আর মানসিক অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছিল। ফলে তার মধ্য থেকে কামশক্তি লোপ পায়। একদিন লুঠ, দাঙ্গাহাঙ্গামা আর খুনের পরে সে এক মুসলমান যুবতীকে অপহরণ করে। তারপর বৈচিত্র্যের জন্যে সেই তরুণীর সঙ্গে সহবাস করতে গিয়ে দেখে, যখন সে সেই মেয়েটিকে কাঁধে করে নিয়ে আসছিল তখনই সে মারা গেছে, এবং সে সহবাসে উদ্যত সেই ঠাণ্ডা মৃতদেহের সঙ্গে। তার সব কামুক ভাবনার আর কামস্পৃহার অবসান ঘটল বরফের মতো শবদেহের স্পর্শে। এই অভিজ্ঞতা তাকে নপুংসক করে দিল। সেই ঠাণ্ডা মাংসস্তূপের স্পর্শে মৃত্যু হয়েছিল তার কামপ্রবৃত্তির।

যদি ইশর সিং আগে কোনো কামশীতল স্ত্রীলোক-এর সঙ্গে মিলিত হত, অথবা যদি নিজে সে কাম-অনুত্তাপ হত—তাহলে সে এই যৌন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হত না। কিন্তু সে নিজে কামপ্রবল, এবং কামপ্রবলা নারীর সঙ্গে সে সহবাসে অভ্যস্ত। লুণ্ঠন, দাঙ্গা, হত্যা—তার প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ, যা তার মনকে কখনও প্রভাবিত করে নি; তার বিচারবুদ্ধিকে কখনও আচ্ছন্ন করে নি অসংখ্য হত্যা। কিন্তু যখন সে সেই মৃত যুবতীর শবদেহের সঙ্গে সহবাসে উদ্যত হল, হিমশীতল ঠাণ্ডা মাংসস্তূপের স্পর্শে অন্তর্হিত হল তার পুরুষত্ব।

“ঠাণ্ডা গোস্ত্” একটি শিউরে-ওঠা কাহিনী, কিন্তু কখনই অশ্লীল নয়। কাহিনীর নামই শীতলতার আবহ সৃষ্টি করে—উত্তাপের নয়। ইশর সিংয়ের অভিজ্ঞতা কি কারও মনে কামপ্রেরণা জাগাতে পারে?

এই কাহিনীতে ইশর সিংয়ের মুখে যে-ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা তার মতো বর্বর, বন্য এবং আদিম-স্বভাব মানুষেরই উপযুক্ত। তার আচরণ তারই মতো। কুলবন্ত সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

স্বভাবতই মণ্টো তাঁর কাহিনীর চরিত্রের চরিত্র বদলাতে পারেন নি। জীবিতকালে মণ্টো চিৎকার করে বলেছেন—তিনি অশ্লীল নন। সাহিত্য কখনও অনৈতিক নয়। শুধু সেই রচনাই অশ্লীল যা শুধু অশ্লীলতাসৃষ্টির জন্যেই রচিত।

পাকিস্তানে নিষিদ্ধ এবং বিতর্কিত আরেকটি গল্প “খোল্ দো”। দেশবিভাগের পরে ভারত থেকে পাকিস্তানে-আগত একটি শরণার্থী মেয়ের করুণ আর মর্মান্তিক কাহিনী “খোল্ দো” (খুলে দাও)।

যুবতী সাকিনা ধর্ষিতা হয়েছিল আটজন রাজাকর দ্বারা। একটি রাতের মধ্যে সে এতজন ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিল যে “খোল্ দো” কথাটি তার কাছে একটি অর্থই বহন করত।

সাকিনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সন্ধের দিকে খুঁজতে-খুঁজতে তার পিতা সিরাজুদ্দীন যখন সেখানে হাজির হল তখন দেখতে পেল যে চার-জন লোক স্ট্রেচারে ক'রে একটি মেয়েকে নিয়ে আসছে। সিরাজুদ্দীন জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, মেয়েটিকে রেল-লাইনের ধারে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তারা হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। সিরাজুদ্দীন তাদের পেছনে-পেছনে যেতে লাগল। ডাকতারের হেফাজতে মেয়েটিকে সঁপে দিয়ে লোক চারটি চলে গেল। একটি কাঠের থামের পেছনে হেলান দিয়ে সিরাজুদ্দীন অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরে সে আস্তে-আস্তে সেইখানে গেল যেখানে মেয়েটিকে রাখা হয়েছিল। সেখানে আর কেউ ছিল না। সিরাজুদ্দীন আর-একটু এগিয়ে গেল, একটি আলোকরেখা সেই সংজ্ঞাহীন দেহটির মুখে পড়েছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল মেয়েটির মুখের বড়ো একটি তিলের উপরে। সঙ্গে-সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠল, ‘সাকিনা—সাকিনা—’

এই সময়ে ডাকতার এসে জিজ্ঞেস করল, ‘কী ব্যাপার?’

সিরাজুদ্দীন কোনোক্রমে উত্তর দিল, ‘আমি এই হতভাগিনীর বাপ।’

ডাকতার সেই অচেতন দেহটির দিকে তাকিয়ে কাছে এসে তার নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করলেন। তারপর ভালো করে দেখবার জন্যে বললেন, ‘খিড়কি খোল্ দো।’

মনে হল—সাকিনার অচেতন দেহটি একটু নড়ে উঠল। তার নির্জীব দেহের হাতটি কোনোক্রমে সালওয়ারের ফিতের গিঁট খুলে দিয়ে নিম্নাঙ্গ উন্মুক্ত ক'রে দিল।

সিরাজুদ্দীন পাগলের কতো চিৎকার ক'রে উঠল, ‘আমার মেয়ে বেঁচে আছে—আমার মেয়ে বেঁচে আছে—’

ডাকতার সেই সংজ্ঞাহীন দেহের দিকে তাকিয়ে এবং তার উপরে “খোল্ দো” কথার প্রতিক্রিয়া দেখে ঘামতে লাগলেন।

“অশ্লীল লেখক মণ্টো” সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলা যায় যে সাদাৎ হাসান মণ্টো ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যক্তি, সম্মানিত বংশে তাঁর জন্ম, সম্মানিত সমাজে তিনি বিচরণ করেছেন। তাঁর গল্পে রয়েছে দুঃখ, তাঁর কাহিনীর নারীচরিত্রে বিষাদ, বিভিন্ন চরিত্রে যন্ত্রণা। এবং যখন আমরা দুঃখ, বিষাদ আর যন্ত্রণার কথা বলি—তখন অশ্লীলতার অবকাশ কোথায়?

উলঙ্গ সমাজকে আরও নগ্ন করে দেখাবার জন্যেই মণ্টোর উপরে লোকের ক্রোধ বর্ষিত হয়েছিল। সব রোষ উপেক্ষা করে মণ্টো এই ঘৃণিত সমাজ, সমাজের তথাকথিত আবর্জনা বেশ্যাচরিত্র-চিত্রণে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু অনেকের মনে আবার প্রশ্ন জেগেছে—সমাজের এই দুষ্ট ক্ষত, বারাঙ্গনা চরিত্রাঙ্কনে কি এই পাপ দূর হয়ে যাবে? যেখানে সদ্‌গুণ-দুর্গুণ, ভালো-মন্দ, শোষক-শোষিত, শাসক-শাসিত—সবই রয়েছে সেখানে গণিকাবৃত্তি আর ভ্রষ্টাচারচিত্রণ কি অনিবার্য? এই রূপায়ণ কি লেখকের পরম কর্তব্য? পতিতালয়-চিত্রণে, দুষ্ট ক্ষত উদ্‌ঘাটন করলেই কি বেশ্যাবৃত্তির অবসান ঘটবে?

প্রখ্যাত উর্দু-সাহিত্য-সমালোচক আলে আহমদ ‘সুরুর’ বলেছেন—‘মণ্টো মোপাসাঁ আর মম দুজনার দ্বারাই প্রভাবিত। তিনি শ্রেষ্ঠ কথাকার। কাহিনী-রচনা তিনি শেখেন নি, সেই শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। সেক্‌স্ আর নগ্নসত্যের উদ্‌ঘাটন তাঁর প্রিয় ছিল। তাঁর কাহিনীতে জীবন তো ছিল, কিন্তু সে-জীবন সীমিত এবং একটি বিশেষ দিকে প্রবাহিত। মণ্টো মনে করতেন—এই সমাজে মানবিকতা কম, দুষ্প্রবৃত্তিই অধিক। এ-সত্য অনস্বীকার্য।’

সাজ্জাদ জাহিরও মণ্টোকে লিখেছেন—‘আপনার কাহিনী “বু” খুবই বেদনাদায়ক, কিন্তু অর্থহীন। গল্পটিতে উচ্চবিত্তদের যৌন-বিকৃতির কথা। যদিও কাহিনীর মধ্যে বাস্তবতা আছে, কিন্তু এই কাহিনী-পাঠ সময়ের অপচয় মাত্র।’

এই সমাজে অন্য ধরনের লোকও আছে—যারা অবমানিত মানবাত্মার পুনরুত্থানে সতত সংঘর্ষশীল, যারা অত্যাচার-শোষণ-কুরীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, যারা নতুন পৃথিবী সৃষ্টির প্রয়াসে সৃজনশীল—কিন্তু মণ্টো সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। জীবনের প্রতি তাঁর ছিল বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি। যে-সমাজে তিনি বাস করেছেন—তারই বিরোধিতা করেছেন, সেই সমাজ-গোষ্ঠী থেকেই তিনি ছিলেন বিচ্ছিন্ন।

প্রেমচাঁদ আর মণ্টো

মণ্টো যদি সাহিত্যিক না হতেন, হয়তো তিনি হতেন স্বাধীনতাসংগ্রামী। শহীদ ভগৎ সিংয়ের তিনি ছিলেন বিশেষ অনুরাগী, যাঁর মূর্তি তিনি রেখেছিলেন নিজের ড্রয়িংরুমে। তার আবাস-ভূমি ছিল অমৃতসর। তার প্রথম দিকের একটি গল্পের পটভূমি জালিয়ান-ওয়ালাবাগ। এই সময়ে বহু লোকই স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

১৯০৯ সালে প্রকাশিত প্রেমচাঁদের ‘সোজ-ই-ওয়াতন’ (জন্মভূমির দুঃখ) গল্প ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ

করে। বেনারসের ইংরেজ কালেকটর প্রেমচাঁদকে ডেকে ভীতিপ্রদর্শনও করেছিলেন। কিন্তু প্রেমচাঁদ তাতে দমে না-গিয়ে বাজার থেকে কিশোর শহীদ ক্ষুদিরামের একটি মূর্তি কিনে নিয়ে ঘরে সাজিয়ে রেখেছিলেন।

প্রেমচাঁদের (১৮৮০-১৯৩৬ সাল) সঙ্গে অনেক মিল ছিল মণ্টোর। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর শোষণের বিরুদ্ধে দুজনেই সংগ্রাম করে গেছেন নিজ নিজ পদ্ধতিতে। দুজনেই কিছুদিনের জন্যে চিত্রজগতে কাজ করেছেন এবং দুজনেই এই জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা দুজনেই বিশ্বাস করতেন, চলচ্চিত্রের এই মাধ্যমটি জনমানসের সর্বাধিক পবিত্র অনুভূতিকে স্বার্থসিদ্ধিতে প্রয়োগ করেছে। দুজনেই বিশ্বাস করতেন যে দরিদ্র জনতার দুঃখ-বেদনাকে রূপায়িত করার জন্যেই তাঁরা নিয়তি-নির্ধারিত। এই কর্তব্যপালনে ছিল তাঁদের আত্মার আরাম।

প্রেমচাঁদ ও মণ্টো দুজনকেই প্রথম বয়সে নানা পারিবারিক পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। সারা জীবন দুজনেই হয়েছেন আর্থিক অনটনের যন্ত্রণায় জর্জরিত।

চারপাশের জীবন থেকে দুজনার কাহিনীর মধ্যেই স্থান লাভ করেছে নিম্নবর্গের বিচিত্র চরিত্র। প্রেমচাঁদও দেহোপজীবিনীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন আন্তরিক মানবতা। "সেবাসদনে"র সুমন নিষ্পাপ গৃহবধূ হয়েও বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রেমচাঁদ মারা গেছেন অতিরিক্ত পরিশ্রমে, লিভারের ক্ষতে, মণ্টো অতিরিক্ত মদ্যপানে—লিভার এবং হৃদ্‌যন্ত্রকে বিকল করে। দুজনার জীবনেরই পরিশুদ্ধ পরিণতি দুঃখযন্ত্রণার অগ্নিদহনের মধ্য দিয়ে।

১৯৫১ সালের অকটোবর মাসে প্রকাশিত একটি গল্পসংগ্রহের মুখবন্ধে মণ্টো লিখেছেন—'যদি এখন আমার মৃত্যু হয় আমি এ-বিষয়ে সচেতন যে আমি রেখে যাব বহু আইডিয়া, কিন্তু আমাকে ছেড়ে যেতে হবে আমার এক স্ত্রী এবং তিন কন্যাকেও। তাদের রোগের চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ কিনবার টাকা আমার নেই। ভিক্ষা করা আমি ঘৃণা করি। আমার সমালোচকেরা মনে করেন—আমি প্রগতিশীল, অন্যেরা কমিউনিসট। আমার সরকার মনে করেন—আমি অশ্লীল। অশ্লীলতার দায়ে তাঁরা আমাকে আদালতে নিয়ে যান, আবার তাঁরাই বিজ্ঞাপিত করেন—সাদাৎ হাসান মণ্টো দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। সরকারের মনোভাব দেখে আমি ভয় পাচ্ছি—পাছে না আমার শবদেহের গলায় আমার লেখার পুরস্কার হিসেবে একটা মেডেল লটকে দেন। সত্য আর যন্ত্রণার পথে আমার অনুসন্ধিৎসু অন্বেষার সেটা হবে সবচেয়ে বড়ো অপমান।'

মদ্যপান করতে-করতে কৃষন চন্দরকে মণ্টো একবার বলেছিলেন—'জীবনকে দেখবে না, পাপ করবে না, মৃত্যুর কাছাকাছি যাবে না, দুঃখ অনুভব করবে না—তবে তুমি কী লিখবে?'

মণ্টো বাস্তব জীবনে সত্যিই এইসব করেছিলেন, মৃত্যুকে কাছে ডেকেছিলেন আর নিজে চলে গিয়েছিলেন মৃত্যুর কাছাকাছি। তমসাঘন নিরাশা তাঁকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল মদের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল। মণ্টো নিজেই বলেছেন—'ম্যয় পাক্কা রাণ্ডিবাজ হুঁ।'

কঠিন পৃথিবীর নিষ্ঠুর জীবনযন্ত্রণা মণ্টোকে একাধিকবার পাগলখানায় তাড়িত করেছে। উন্মাদ-আগার থেকে আরোগ্যলাভ করে বাইরে এসে একবার তিনি বলেছিলেন, 'ছোটো পাগলখানা থেকে এখন আমি বড়ো পাগলখানায় এসে গেছি।'

মণ্টো তাঁর কাহিনীর পাত্র আমাদের সমাজের চারপাশ থেকেই সংগ্রহ করেছেন। দুনিয়ার সব জঞ্জাল থেকে মোতি আহরণ করে আনতেন তিনি।

ভারতবর্ষের বাতাবরণ যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্যে দূষিত হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি বম্বে থেকে লাহোরে চলে যান। কিন্তু সেখানে গিয়েও সুখে থাকতে পারেন নি। জন্মভূমি ভারতকে সব সময়ে মনে পড়ত তাঁর।

প্রসঙ্গত, অনেক মানবিক দুর্বলতাও ছিল মণ্টোর চরিত্রে। দেশবিভাগের পরে দেশত্যাগী মানুষের ফেলে-যাওয়া ভালো বাড়িতে থাকবার জন্যে তিনি লাহোরে গিয়ে বাস করতে থাকেন এবং তাঁর অতি অন্তরঙ্গ সুহৃৎ বিখ্যাত উরদু লেখিকা ইসমৎ চুঘতাই-কেও বারবার অনুরোধ করেন পাকিস্তানে চলে আসবার জন্যে। মণ্টো বলেছিলেন, 'পাকিস্তানে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ওখান থেকে পালিয়ে-আসা মানুষের বাড়ি পাওয়া যাবে। ওখানে আমরাই হর্তা-কর্তা। খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করে যাব।' মণ্টোর এই কথার উপরে ইসমৎ চুঘতাই মন্তব্য করেছেন, 'তখনই আমি বুঝতে পারলাম—মণ্টো কী অবুঝ! যে-কোনো মূল্যে সে নিজের জীবন বাঁচাতে চায়। নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে সে অন্যের সারা জীবনের উপার্জনে সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে উন্মুখ ও দ্বিধাহীন। ওর প্রতি আমার মনে ঘৃণাভাব জাগল।'

লাহোরে খুব খুশিতে মণ্টোর দিন কাটছিল। কিন্তু কয়েক বছর পরে "মণ্টো কা এক খৎ (চিঠি) আয়া, 'কোশিশ করকে মুঝে হিন্দুস্থান বুলায়া লো।'" ('মণ্টো : মেরা দোস্ত, মেরা দুশমন'—ইসমৎ চুঘতাই)।

পাকিস্তানে বসে তিনি বহু কাহিনী লেখেন এবং তাঁর বহু গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিছু তাহলেও আর্থিক অনটন তাঁর লেগেই ছিল। "জেব-এ-কাফন" রচনায় এই অসচ্ছলতা সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আমার এখনকার জীবন দুঃখ আর দুর্ভাগ্যে ভরপুর। দিনরাত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও রোজকার খানা জোগাড় করতে পারি না। আমাকে সর্বদা এই চিন্তাই পীড়িত করছে যে—আমি মারা গেলে আমার তিন মেয়ে আর আমার বিবির দেখাশোনা কে করবে? আমি পাগল, নগ্নবাদী লেখক হতে পারি, কিন্তু আমার মনে একথাও জাগরূক যে আমি এক স্ত্রীর স্বামী এবং তিন কন্যার পিতা। যদি এদের কারোর অসুখ করে আর তার চিকিৎসার জন্য যদি আমাকে দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষা করতে হয়—তাহলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী আছে?'

মৃত্যুর পরে মণ্টোকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে কৃষন চন্দর এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'মণ্টো এক বহু বড়ো গালি দিল। এমন কেউ ছিল না যার সঙ্গে তার ঝগড়া হয় নি। না প্রগতিশীল, না সংস্কারবাদী, না পাকিস্তান, না হিন্দুস্থান—কারোর উপরেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। রাশিয়া বা আমেরিকা—কাউকেই তিনি সমর্থন করেন নি। তাঁর পিয়াসী আত্মা কিসের জন্যে ভুখা ছিল—কে জানে! তাঁর ভাষা ছিল অত্যন্ত কঠোর, লিখবার ভঙ্গি তীক্ষ্ণ, তীব্র কণ্টকময় ও নির্দয়। কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্টকময়তার অন্তরালে ছিল সুস্বাদু রসময় জীবনধারা। তাঁর ঘৃণায় ছিল প্রেম, ইজ্জত-লুটে-যাওয়া নারীর কাহিনীর মধ্যে পবিত্রতা। জীবন মণ্টোর প্রতি সুবিচার করে নি, কিন্তু যুগ তাঁকে যোগ্য সমাদর দেবে।'

বস্তুত, মণ্টো তাঁর কাহিনীতে নিজের কথা বলেছেন যা তাঁর লেখায় যোগ করেছে অতিরিক্ত সৌন্দর্য। তাঁর অতুলনীয় লিখনশৈলী তাঁকে উরদু সাহিত্যে আধুনিক যুগের মহান কলাকারের সম্মান দিয়েছে। মণ্টোর রচনার ভাষা সরল, সুবোধ, মিতব্যয়ী, প্রভাবশালী।

উরদু সাহিত্যের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক প্রেমচাঁদ আর মণ্টো সামাজিক অনুশাসনের কাছে নতিস্বীকার করেন নি। তাঁদের জীবনে ছিল না সুখময় শান্তির আরাম। জীবনধারণের জন্যে প্রেমচাঁদের আকাঙ্ক্ষা ছিল সাধারণ ডালভাত, সম্ভব হলে তাতে মাখনের ছিটেফোঁটা এবং অতি সাধারণ পরিধেয়। মণ্টো তাও আশা করেন নি। মণ্টো তাঁর সমাধিলিপি নিজেই জীবিত অবস্থায় লিখে গিয়েছিলেন—

'বিশাল মাটির স্তূপের নীচে এইখানে মণ্টো সমাধিস্থ। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কাহিনী-রচনার গোপন সূত্রটিও। মাটির নীচে সমাধিস্থ হয়ে সে অবাক হয়ে ভাবছে—ছোটো গল্পের শ্রেষ্ঠতর স্রষ্টা কে?—মণ্টো অথবা ঈশ্বর?'

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

উনিশ

> 'And now...I will rehearse a tale of love which I heard from Diotima of Mantineia, a woman wise in this...She was my instructress in the art of love...'
> (Socrates to Agathon : 'Symposium'—Plato)

সেই সন্ধ্যায় পূর্বকথানুসারে যখন কেশবপল্লীতে 'হাজারিলালের' কুটিরে যাই, বুঝি নাই যে আবার আমার একটি মেটামরফসিস আসন্ন। জীবন কী রহস্যময় বিষয়! প্রতিটি পরবর্তী পদক্ষেপে কী ঘটিবে তুমি জান না, জানিবার কোনো উপায় নাই। কর্মফল-তত্ত্বে বিশ্বাস নাই, কারণ উহা যুক্তিবিরহিত। একই কর্মে এক২ প্রকার ফল ফলিতে দেখ না কি? সর্বত্র যেন আকস্মিকতা ওত পাতিয়া আছে। দুইয়ে দুইয়ে চারি হইবার গ্যারাণ্টি নাই।

হরিবাবু আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন। হাতে একটি লাঠি ও একটি লণ্ঠন লইয়া বাহির হইলেন। মাথায় হিন্দুস্থানীদের মতন পাগড়ি, গায়ে কম্বল এবং পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যা। হিমের গাঢ়তা জীবজগতকে নৈঃশব্দ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। হরিবাবু বলিলেন; এ কী। তুমি আলোয়ান আন নাই কেন?

হাসিয়া বলিলাম, আমার রক্তে কিছু আছে। শীত কাবু করিতে পারে না। কিন্তু আপনি কি অন্যত্র যাইবেন?

হ্যাঁ। হরিবাবু চাপা স্বরে বলিলেন। আমারই ভুল হইয়াছে! তোমাকে আভাসে বলা উচিত ছিল আমরা একটি দুর্গম স্থানে যাইব!

আপনার সহিত নরকে যাইতেও আপত্তি নাই। তবে আমি নিরস্ত্র।

হরিবাবু হাসিলেন।...না, না। নরহত্যা করিতে যাইতেছি না। একটু অপেক্ষা করো। বলিয়া তিনি তাঁহার কুটিরের তালা খুলিয়া ঢুকিলেন। তাহার পর একখানি তুলার কম্বল আনিয়া বলিলেন, গায়ে জড়াইয়া লও। মাথা পর্যন্ত ঢাকো।

বাঁধের শিশিরসিক্ত ঘাসে দুইজনে হাঁটিতেছিলাম। কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, এইপ্রকার প্রশ্ন করার অভ্যাস আমার নাই। শৈশব হইতেই এই নির্লিপ্ততা আমার মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। আমার পিতার যাযাবর স্বভাবই ইহার মূলে। সর্বক্ষণ সকল মুহূর্তের জন্য আশৈশব প্রস্তুত থাকিয়াছি, কোথাও যাইতে হইবে। দেবনারায়ণদা সেদিন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ভাবিলাম, যাযাবর নরগোষ্ঠী ছাড়া এমন উক্তি কাহাদের মুখ দিয়া বাহির হইবে? ওইসকল শাস্ত্রপ্রণেতা নাকি আর্য্য ছিলেন। হরিদা সেদিন উদাত্তস্বরে আমার রক্তেরও আর্য্যত্ব সাব্যস্ত করিয়াছেন! হ্যাঁ, এই একটি ক্ষেত্রে ২ + ২ = ৪ হইল বটে! মনে মনে হাসিতে থাকিলাম।

শফি! শস্যচোরদের হাত হইতে শস্য বাঁচাইতে কৃষকেরা আমাকে যেভাবে তুমি দেখিতেছ, সেইভাবে রাত্রিকালে শস্যক্ষেত্র দেখিতে যায়। হরিবাবু চাপাস্বরে বলিলেন। কিন্তু কাহারও সম্মুখে পড়িলে তুমি কী কৈফিয়ৎ দিবে ভাবিতেছি।

বলিলাম, আপনি জানেন না, ইতিমধ্যে সর্বত্র ছিটগ্রস্ত, অর্ধোন্মাদ, এমন কি বদ্ধপাগল বলিয়া আমার সুখ্যাতি রটিয়াছে?

হরিবাবু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, উহা অংশত সত্যও বটে। তবে জিনিয়াস ব্যক্তিরা এইরূপ হইয়া থাকেন। শফি, তোমার মধ্যে প্রতিভাধর পুরুষের তাবৎ লক্ষণ পরিস্ফুট।

হরিবাবু কি বিদ্রূপ করিতেছেন? গম্ভীর হইয়া চুপচাপ হাঁটিতে থাকিলাম। তিনি বুদ্ধিমান। একটা কিছু আঁচ করিয়া বলিলেন, তুমি কি রাগ করিলে আমার কথায়? শফি, তুমি জান না তুমি কী। স্ট্যানলিকে হত্যার কালে তোমার এক শক্তি দেখিয়াছি। আবার তুমি যখন গভীর দার্শনিক তত্ত্বমূলক গ্রন্থ নিষ্ঠাবান ছাত্রের মতন অভিনিবেশসহকারে পাঠ কর, তখনও তোমার মধ্যে আর-এক শক্তি দেখিয়াছি। দেবী দুর্গা এবং দেবী সরস্বতী উভয়ের অনুগ্রহ লাভ না করিলে ইহা সম্ভব হয় না।

ইচ্ছা হইল বলি, যমুনাপুলিনের বংশীধারী গোপীবল্লভেরও বুঝি বা অনুগৃহীত আমি—নতুবা কেন এই হৃদয়তন্ত্রী কোনো এক চিরন্তনী শ্রীরাধার জন্য নিরন্তর ব্যাকুলসুরে বাজিতেছে আর বাজিতেছে? কিন্তু হরিবাবু শাক্ত। গোঁড়া শাক্ত তো অবশ্যই। বৈষ্ণবদের কথা শুনিলেই চটিয়া আগুন হন দেখিয়াছি। তাই চুপ করিয়া থাকিলাম। ধর্ম ব্যাপারটার মধ্যে আসলে একটা বিশ্বজনীন সামান্যতামূলক আদল রহিয়াছে। ফরাজি এবং সুফিদের সঙ্গে যথাক্রমে যেন শাক্ত এবং বৈষ্ণবের কেমন একটা মিল! ইহুদিদের তোরাপন্থী এবং কাব্বালাপন্থী, খ্রীষ্টানদের ক্যাথলিক এবং প্রেসবাইটেরীয় গোষ্ঠী...

হরিবাবু হঠাৎ থামিয়া গেলে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। বলিলাম, কী হইল?

তিনি লণ্ঠনটি নাড়িতে থাকিলেন। এবার কিছু দূরে একটি আলো কিয়ৎক্ষণ আন্দোলিত হইয়া যেন নিভিয়া গেল। এখান হইতে অনাবাদি এলাকার শুরু। কাশবন, উঁচু গাছপালার জঙ্গল, জলাভূমি। বাঁধ বাঁকা হইয়া পশ্চিমে উঁচু এলাকায় গিয়া শেষ হইয়াছে। হরিবাবু উত্তেজিতভাবে বলিলেন, উহারা আসিয়া গিয়াছে! জুতা খুলিয়া হাতে লও। অল্প একটু জলকাদা হইতে পারে।

উহারা কাহারা এই প্রশ্ন করা আমার স্বভাববহির্ভূত। বামদিকে নামিয়া গিয়া অল্প নহে, যথেষ্ট জলকাদায় পড়িলাম। হিমে দুই পা নিঃসাড়। কাশবনের শিশিরে ভিজিয়া জবুথবু অবস্থা হইল। কিছুদূর চলার পর সম্মুখে ঘনকালো পাহাড়সদৃশ অথবা অন্ধকারেরও অন্ধকারতম একটি অংশের নিকটবর্তী হইয়া হরিবাবু অনুচ্চস্বরে বলিলেন, বন্দেমাতরম্!

ওই উঁচু কালো বিশালতার অভ্যন্তর হইতে প্রতি-

ধ্বনিত হইল, বন্দেমাতরম্‌!

এতক্ষণে বুঝিলাম উহারা কাহারা। বিশালতাটি উঁচু গাছপালার জঙ্গল। একটি বটগাছের তলায় প্রকাণ্ড শিকড়গুলি লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট হইল। শিকড়গুলিতে তিনজন লোক বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হরিবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন। সত্যচরণ বসু, কালীমোহন বাঁড়ুজ্জে, তৃতীয় জন অমলকান্তি দাশ। প্রথম দুইজনের বয়স পঁচিশ কিংবা দুই-এক বৎসর কমবেশি হইবে। তৃতীয়জন আমার বয়সী। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলাম। কোথায় যেন দেখিয়াছি! হঠাৎ সে উঠিয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল। বলিল, কী আশ্চর্য! তুমি সেই শফি না? ছোটদেওয়ানসায়েবের ভাইপো!

অমনি আমিও তাহাকে চিনিলাম। বলিলাম, কেমন আছ অমল?

অমলকান্তি উচ্ছ্বসিতভাবে বলিল, তোমাকে যে চিনিতে পারিলাম, তাহার কারণ তোমার ওই শীতল চাহনি। নতুবা তুমি গোঁফ রাখিয়া ধুতিশার্ট পরিয়া এমনই বাবু হইয়াছ যে কাহার বাপের সাধ্য চিনিতে পারে? উপরন্তু তোমার বপুখানিও পান্না পেশোয়ারির মতন প্রকাণ্ড হইয়াছে।

দ্রুত বলিলাম, পান্না পেশোয়ারির সম্বাদ কী?

তুমি জান না? অমলকান্তি অবাক হইয়া বলিল।...সে কতকাল হইল, তোমাদের জাহান্নাম গুলজার করিতেছে। কেহ ইট মারিয়া তাহার ঘিলু বাহির করিয়াছিল। পুলিশ চুল্লুকে সন্দেহ করিয়া প্রচণ্ড পীড়ন করিয়াছিল। শেষে প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস পায়। কিন্তু তুমি হঠাৎ স্কুল ছাড়িয়া কোথায়—

বাধা দিয়া কালীমোহন বলিলেন, অমল! পরে বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলিও। অগ্রে কাজের কথা হউক।

মৃদুস্বরে তাঁহারা 'কাজের কথা' শুরু করিলেন। আমার বুকের ভিতর তখন ঝড় বহিতেছে। আনন্দ, নাকি অন্যকিছু, জানি না। শুধু জানি আমি রূপান্তরিত হইতেছি। খালি সিতারার মুখ ভাসিয়া আসিতেছে। দূরে সরিয়া যাইতেছে। আবার কাছে আসিতেছে। সিতারা আমার সহিত যেন জলক্রীড়া করিতেছে, যে-জলক্রীড়ায় একদা দিনশেষে সে আমার সঙ্গে মাতিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। ডাক দিয়াছিল, আও শফিসাব! খেলুঙ্গি!

'কাজের কথা' চলিতেছিল। মহিমাপুর এবং পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি মহালে এবার শুখায় অনাবাদ। কিন্তু জমিদারদের বেতনভোগী পরগণা-ম্যানেজারগণ এখনই প্রজাদের হুমকি দিতেছে। ওইসকল পরগণায় গত বৎসরও ভাল ফসল হয় নাই। কৃষক প্রজাদের অবস্থা সর্ব্বস্বান্ত। বিহারমুলুকের মুণ্ডাসর্দার বীরসা মহারাজের দৃষ্টান্তে বহুস্থানে কৃষকেরা জোট বাঁধিতেছে। ইংরাজ অফিসার এবং পুলিশবাহিনীর কাছে রাজধানী কলিকাতা হইতে লাটবাহাদুরের হুঁশিয়ারি আসিয়াছে, এমত সম্বাদ আছে। এমন কী, লোহাগড়া পরগণার দিকে সংপ্রতি বহরমপুর সেনানিবাস হইতে একটি গোরাপল্টনও রওনা হইয়া গিয়াছে। গোরাদের ভয়ে পথিপার্শ্বের তাবৎ গ্রামের মানুষজন গ্রাম ছাড়িয়া মাঠেজঙ্গলে লুকাইয়া পড়িতেছে। ওদিকে বিহারের রাঁচীমুলুকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে হাজার-হাজার সাঁওতাল-মুণ্ডা-কোঁড়া-মুসহর প্রমুখ আদিবাসী বাঙ্গালাদেশে চলিয়া আসিতেছে। এই মহাসুযোগের সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। কলিকাতা হইতে বিপ্লবী বন্দেমাতরম্‌ গুপ্তসমিতির নেতৃবৃন্দের নির্দেশসম্বলিত একটি লাল হরফে ছাপা ইস্তাহার কালীমোহন পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

নিজের রূপান্তরশীল অংশের প্রান্ত হইতে অসহায় বিদ্রোহের বার্তা শুনিতেছি। এ আবার এক সন্ধিকাল জীবনে। কবেই বুঝিতে পারিয়াছি, আমি বিদ্রোহের ধাতুনির্ম্মীত একটি সত্তা। অথচ মাঝে-মাঝে আমার মধ্যে এবম্প্রকার 'টাগ অফ ওয়ার' চলিতে থাকে। উষ্ণতা এবং শীতলতা, জাড্য এবং গতির বড়ই জটিল টানাপোড়েন।

কালীমোহন আমার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, লোহাগড়া থানায় আপনার স্বজাতিভুক্ত এক দারোগা আছে। তাহার নাম মৌলুবি কাজেম আলি। সে এক জহ্লাদ। তাহার সুব্যবস্থার দায়িত্ব আপনিই লউন।

'স্বজাতি' শব্দটি আমাকে আঘাত হানিল। কিছুক্ষণ আগে অমলকান্তি 'তোমাদের জাহান্নাম' বলিয়াছিল, উহা কানে লই নাই। অমল লালবাগে আমার সহপাঠী ছিল। তাহার পিতা নবাববাহাদুরের কর্মচারী ছিলেন। কেল্লাবাড়ি এলাকায় বাস করিতেন দেখিয়াছি। অমলের দিকে চাহিয়া আস্তে বলিলাম, আমার অসুবিধা আছে। অন্তত মাঘ মাস পর্যন্ত আমার পক্ষে এই আবাদ এবং আশ্রম ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া কঠিন। দেবনারায়ণদার আশ্রিত আমি। তিনি—

বাধা দিয়া হরিবাবু বলিলেন, না কালীদা! লোহাগড়া শফির অজানা জায়গা। উহার একটা কিছু ঘটিয়া গেলে এই আবাদ ও আশ্রমের ওপর প্রত্যাঘাত আসিবে। ফলে আমার বিপদ ঘটিবে। এমন দুর্ভেদ্য ব্যূহ বলুন বা আশ্রয় বলুন, আর আমি পাইব না। সত্যচরণ এবং অমলকান্তি উভয়েই হরিবাবুর কথায় সায় দিলেন।

সত্যচরণ বলিলেন, ওই দারোগার ব্যবস্থা এখনই করিলে উল্টা ফল হইতেও পারে। শফিবাবুই বলুন, ইহা ঠিক কি না যে, মুসলমানের গায়ে হাত পড়িলে মুসলমানসমাজ ক্ষেপিয়া উঠিবে? আমরা মুসলমানদেরও পাশে লইতে চাই কি না? কলিকাতা এবং ঢাকায় আমাদের কিছু সংখ্যক মুসলমান সদস্য আছেন। ইংরেজকে তাড়াইতে হইলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন কি না?

সত্যচরণবাবুকে আমার অত্যন্ত পছন্দ হইল। কালীমোহনবাবুকে গম্ভীর দেখাইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, হরিনারায়ণ! শীত করিতেছে। অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইলে বিপদের আশঙ্কা আছে কি?

হরিবাবু সহাস্যে বলিলেন, না। ইহা বসতি অঞ্চল হইতে দূরে, উপরন্তু দুর্গম। কেহ দেখিলে ভাবিবে ভূতপ্রেত।

তিনি এবং অমল উৎসাহে শুষ্ক পত্র ও কাঠকুটা কুড়াইতে থাকিলেন। শিশিরে সিক্ত হওয়ার ফলে আগুনের বদলে ধোঁয়াই বেশি হইল। বৃত্তাকারে বসিয়া তাঁহারা মৃদুস্বরে আবার 'কাজের কথায়' মগ্ন হইলেন। আমি শুধু সিতারার কথা ভাবিতেছিলাম। সে পূর্ববৎ ঝড়ে অথবা প্লাবনতরঙ্গে একবার কাছে একবার দূরে সরিতেছিল।

আর ঠিক এইসময় আমার বুজুর্গ পিতার ন্যায় আমি একটি মোজেজা অথবা 'Vision' দেখিলাম। কিম্বা খ্রীষ্টীয় তত্ত্বে ইহাকেই Revelation কহে কিনা জানি না।

একদা প্রকৃতিজগতে একটি নদীর তীরে এক আদিম নারী আমাকে দেহের সোপানে টানিয়া তুলিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, এইরূপে দেহের সোপানসমূহ অতিক্রম করিয়াই হয়তো প্রেমের মন্দিরে পৌঁছাইতে হয়। তখন আমি এক অপরিণতবুদ্ধি অপিচ এঁচোড়েপাকা কিশোর মাত্র। কিন্তু তাহার পর এক প্রাচীন জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত রাজধানীর প্রান্তে অপর এক নারী—যে আদিম নহে, অভিজাতবংশীয় কন্যা—অপর এক নদীর তীরে 'আও শফিসাব, খেলুঙ্গি' বলিয়া ডাক দিয়া মনের সোপানে স্থাপন করিয়াছিল। ওই সোপানের শীর্ষেই প্রকৃত প্রেমের মন্দির। স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি দীপ জ্বলিতেছে নিষ্কম্প্র, অনির্বাণ। ধূপের সুগন্ধ ছড়াইতেছে। উহাতে সিতারার সিক্ত কেশের ঘ্রাণ। তরঙ্গের ভাষায় সে কহিতেছে, আও শফিসাব, খেলুঙ্গি! আও শফিসাব, খেলুঙ্গি! আও শফিসাব, খেলুঙ্গি!

সিদ্ধান্ত করিলাম, অন্তত একবেলার জন্যও লালবাগে যাইব।...

> '...Daphne's soft breast was enclosed in thin bark, her hair grew into leaves, her arms into branches, and her feet...were held fast by sluggish roots, while her face became the treetop. Nothing of her was left, except her shining loveliness...'
>
> Metamorphoses—Ovid.

বাঁকিপুরের মুসলিম জমাত ছিল হানাফি সম্প্রদায়ের। হজরত বদিউজ্জামান নুরপুরে থাকার সময় বাঁকিপুরের মাতব্বর লোকেরা ফরাজিমতে দীক্ষা নেয়। বিত্তশালী এই লোকগুলির প্রভাবেও বটে, আবার 'বহুপিরের' কেরামতি বা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে জনরবের ফলে বাঁকিপুরের সমস্ত মুসলমান ফরাজি হয়ে উঠেছিল। গিয়াসুদ্দিনের ওপর তাই প্রবল চাপ পড়তে থাকে। কারণ তিনি 'হিঁদু' হয়েছেন! ব্রহ্মপুরের আশ্রমে যাতায়াত করেন। অন্যদিকে তাঁর গ্রামের হিন্দু বাবুজনেরাও ব্রাহ্মদের প্রতি প্রচণ্ড বিরূপ ছিলেন। তাঁরাও মুসলমানদের তলে-তলে প্ররোচিত করতে থাকেন। তাঁকে একঘরে করা হয়। তিনি ছিলেন বাঁকিপুর পাঠশালার শিক্ষক। তাঁকে তাই পণ্ডিত গিয়াস বলা হত। নিরক্ষররা বলত 'পুণ্ডিত'। তাঁর ভিটেটুকু বাদে আর মাটি ছিল না। বহুকাল আগে স্ত্রী মৃত। একটিমাত্র কন্যা ছিল। তার নাম রেহানা। প্রাইমারি পরীক্ষায় সে কৃতিত্বের দরুন মাসিক দুটাকা হারে বৃত্তি পেত। তাকে আর পড়ানোর মতো স্কুল গ্রামাঞ্চলে ছিল না। তখন যে-সব 'উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়' ছিল, সেগুলিতে শুধু ছেলেদেরই পড়ানোর ব্যবস্থা। ফলে দুটাকা বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। গিয়াস পণ্ডিত অগত্যা তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন। তখন মুসলিম সম্প্রদায়ে কন্যাপণ প্রচলিত। রেহানাকে যে-কোনো বিত্তশালী পরিবারে পাত্রস্থ করা যেত। রেহানার গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, ঈষৎ রোগাটে গড়ন, সাধারণ বাঙালি মেয়েদের গড় লাবণ্য তার ছিল। তাছাড়া সে বুদ্ধিমতী এবং বিদ্যা-অভিলাষিণী কিশোরী। কিন্তু গ্রাম্য বিত্তশালী পরিবারের তৎকালীন প্রায় নিরক্ষর গাড়ল সদৃশ বয়স্ক পাত্রদের লোনায় যতই জল ঝরুক, গিয়াস-পণ্ডিতবিরোধী তৎপরতা—যা ক্রমশ বর্বর আন্দোলনের রূপ নিচ্ছিল, তাদেরকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করে এবং প্রতিক্রিয়াবশে তারাও মারমুখী হতে থাকে। গিয়াসুদ্দিনের আত্মীয়স্বজনও তাঁকে ত্যাগ করেন। অত্যাচারে অতিষ্ঠ গিয়াসুদ্দিন, অথচ ব্রহ্মপুর আশ্রমে এলে তাঁকে দেখে বোঝাও যেত না কিছু। হাস্য-পরিহাস এবং গম্ভীর তাত্ত্বিক আলোচনায় মগ্ন হতেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বাতাসে খবর ছড়ায়। দেবনারায়ণ সেই খবরে প্রথম-প্রথম ততটা গুরুত্ব দিতেন না। অবশেষে একদিন আসন্ন মাঘোৎসবের প্রস্তুতি উপলক্ষে আলোচনাসভার পর গিয়াসুদ্দিন গোপনে মুখ ফুটে সব কথা বলেন এবং তখনই খেয়ালি দেবনারায়ণ দুখানি গোরুর গাড়ি, একটি পালকি এবং একদল পাইক পাঠিয়ে বাঁকিপুর থেকে গিয়াসুদ্দিন, রেহানা এবং গেরস্থালিটি উপড়ে আনার ব্যবস্থা করেন। গিয়াসুদ্দিন ও তাঁর কন্যা রেহানা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হবেন আগামী মাঘোৎসবে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের দীক্ষা দেবেন। কলিকাতার ব্রাহ্ম সংবাদপত্রে এই উত্তেজনাপ্রদ সংবাদ ছাপা হয়। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ডাকে ব্রাহ্মরা উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠান গিয়াসভাই এবং তাঁর কন্যাকে। ব্রহ্মপুরে তখন সে এক আবেগপূর্ণ কাল। প্রবল ব্যস্ততা।

আর সেই আবেগপূর্ণ কালে শফি ভিন্নতর এক নিজস্ব আবেগে উদ্বেলিত। সে লালবাগ যাবে। কিন্তু দেবনারায়ণ তাঁকে প্রায় বন্দী করে ফেলেছেন। বালিকাবিদ্যালয়, কুটিরশিল্পকেন্দ্র, কতকিছু পরিকল্পনা দেবনারায়ণের। টাকার দরকারে অনাবাদি জঙ্গুলে মাটি যৎকিঞ্চিৎ সেলামি ও খাজনায় বন্দোবস্ত করছেন। উঠবন্দি ভূমিব্যবস্থা, যার অপর নাম সনগুজারি জমিবিলি (অর্থাৎ বাৎসরিক ফসল ফলানোর অধিকার দান)-প্রথা, আবাদে বহুক্ষেত্রে চালু ছিল। এই মওকায় চতুর লোকেরা রায়তি বন্দোবস্তে মাটির মালিকানা লাভে তৎপর হয়। বিহার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ এবং শাসকদের অত্যাচারে পালিয়ে-আসা আদিবাসীদের এক পয়সা দিনমজুরিতে নতুন রায়তরা দ্রুত মাটি কাটিয়ে বাঁধ তৈরি শুরু করে। জঙ্গল অদৃশ্য হতে থাকে। শঙ্খিনী নদীর ধারে বাঁধের কাজ শুরু হয়েছিল অঘ্রানের শেষাশেষি। সেই সময় শফি লালবাগ যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল।

নদীর ওপারে নবাববাহাদুরের মহাল। সেই মহালের গ্রামগুলি থেকে আপত্তি উঠেছিল, ওপারে বাঁধ দিলে সেইসব গ্রামের জমি বন্যায় ডুবে যাবে। এমন-কি বসতিও বিপন্ন হবে। দরখাস্ত পেয়ে নবাববাহাদুর কালেকটর সাহেবকে জানান। লালবাগের এস ডি ও বাহাদুর গিলবার্ট ছিলেন রাগী ও ক্রূর-প্রকৃতির এক অসট্রেলিয়ান ইংরেজ। তিনি যে সার্কেল অফিসারটিকে তদন্তে পাঠান, তাঁর নাম মৌলবি জব্বার খান (তৎকালে শিক্ষিত মুসলিমদের মৌলবি বলা হত)। জব্বার খান অবাঙালি মুসলমান এবং প্রভুর চেয়ে এককাঠি সরেস। তদন্ত করে বাঁধ তৈরি বন্ধের হুকুম দিয়ে গেলেন। নতুন রায়তরা দেবনারায়ণকে এসে ধরল। দেবনারায়ণ প্রতিকারের আশ্বাস দিলেন। তারপর নিভৃতে শফিকে ডেকে বললেন, নবাববাহাদুরের এক দেওয়ান সাহেব তোমার আত্মীয় —তুমিই বলেছিলে। ভাই শফি, এই বিপর্যয়ে তুমিই এখন ভরসা। তুমি গিয়ে তাঁকে বলো। তিনি যেন নবাববাহাদুরকে বুঝিয়েসুঝিয়ে একটা ফয়সালা করেন। ফয়সালা যাই হোক না, আমি মেনে নেব। তোমাকে একা যেতে হবে না। গিয়াসভাইও যাবেন। কারণ তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি। শফি তখনই রাজি হয়ে গেল। শঙ্খিনী নদী ভাগীরথীতে মিশেছে। এখনও এই নদীপথের গম্যতা আছে। তবে মাঘের শেষাশেষি এই গম্যতা থাকবে না। জল কমে যাবে। পৌঁছুতে ভাটি, ফিরতে উজোন। তাই দুজন দাঁড়ি, একজন মাঝি এবং রতন রাজবংশী পাইক নিয়ে ছোট্ট একখানি বজরায় গিয়াসুদ্দিন আর শফি ভোরবেলা নৌকায় রওনা দিল। গিয়াসুদ্দিন সারাপথ তত্ত্ব-আলোচনায় শফির কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিলেন। 'তৌহিদ' আর 'সোঽহম্' এই দুই তত্ত্ব যে এক, তিনি তার ব্যাখ্যা করছিলেন। 'ফানা' এবং 'মোক্ষ', 'ফুক্‌র্-ওয়া-ফানা' এবং 'অস্মিতালোপ', 'ফানা' এবং বৌদ্ধ (মিলিন্দপঞ্‌হ-বর্ণিত) 'পুদ্‌গল-শূন্যতার' একত্ব সাব্যস্ত করতে গিয়াসপণ্ডিত এতই ব্যাকুল যে শফির মনে হচ্ছিল, ইনি এতদিনে এমন একজন স্বধর্মাবলম্বীকে পেয়েছেন, যাকে বোঝাতে চাইছেন, তাঁর হিন্দুধর্মের বেদবেদান্ত-অনুরাগ এবং ব্রাহ্মধর্মে প্রবল আসক্তির পিছনে কোনো বিষয়স্বার্থ নেই! গিয়াসপণ্ডিতকে বড়ো করুণ দেখাচ্ছিল শফির। শেষে বললেন, ডিইস্‌ট্‌দের কথা পড়েছি। রাজা রামমোহন রায় তাঁদের অনুরাগী ছিলেন। তুমি তো ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী, এবার তুমি ডিইস্‌ট্‌ এবং খ্রীষ্টধর্মের সম্বন্ধে কিছু বলো। খ্রীষ্টতত্ত্বে অনুরূপ কিছু আছে কি? তবে তার পূর্বে বলো, তুমি ইংরাজিতে পারদর্শী হলে কিভাবে? শফি অগত্যা বলল, আমি লালবাগে নবাববাহাদুর ইন্‌স্‌টিটিউশনে ছাত্র ছিলাম। ওখানে ইংরাজিই এজুকেশন-মিডিয়াম ছিল। এবার গিয়াসুদ্দিন তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিরক্তিকর প্রশ্ন করতে থাকলেন। শফি দায়সারা জবাব দিল মাত্র। বুদ্ধিমান গিয়াসুদ্দিন বুঝতে পারলেন, যুবকটি চঞ্চলচিত্ত, ঈষৎ ছিটগ্রস্ত এবং স্বল্পভাষী। অথচ এর মধ্যে কী একটা আছে, চোখের চাহনির সাপের শীতলতা এবং সৌন্দর্যময় বলিষ্ঠ গড়নে সিংহের শৌর্য প্রাচীন যোদ্ধাদের কথা স্মরণ করায়। গিয়াসুদ্দিন গুনগুন করে অস্পষ্ট কী গান গাইতে থাকলেন। হয়তো ব্রহ্মসংগীত। দুপুর নাগাদ নৌকা ভাগীরথীতে পৌঁছলে মাঝিরা নৌকা বাঁধল। তীরবর্তী গঞ্জ থেকে চালডাল মাছ কিনে আনল। গিয়াসুদ্দিন স্নানকাতুরে। শফি গঙ্গার

কাজলজলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার হঠাৎ মনে হল, সিতারা এত হিম কেন? এই জলে সিতারার স্বাদ পেতে চেয়েছিল সে।

শঙ্খিনীতে স্রোত ছিল। ভাগীরথী প্রায় নিশ্চল। মাঝে-মাঝে বালির চড়ায় নৌকা ঠেকে যাচ্ছিল। যখন দূরে ইমামবাড়া আর হাজারদুয়ারি প্রাসাদের শীর্ষদেশ দেখা গেল, তখন সূর্য ঢলে পড়েছে। হিমের স্পর্শ তীব্রতর। মাঝি চাঁদঘড়ি বলল, তাও পেছনে উত্তুরে হাওয়া, নৈলে মুখ-আঁধারি বেলা হয়ে যেত। মিঁয়াসায়েব, কেল্লার ঘাটে তো নৌকো বাঁধতে দেবে না। কোথা বাঁধব হুকুম দিন। শফি আস্তে বলল, সাহানগর ঘাটে বাঁধবে চলো!

শফি ব্যগ্রদৃষ্টে তাকিয়ে জাফরগঞ্জের সেই ঘাটটি পেরিয়ে এল। ওই ঘাটে সিতারা তাকে ঠিক এমনি দিনান্তকালে ডাক দিয়েছিল, আও শফিসাব! খেলুঙ্গি। ঘাটটি ফাঁকা। এই শীতে এখন কি কেউ স্নান করতে আসে? শফি আপনমনে একটু হাসল। কেল্লাবাড়ির সামনে দিয়ে নৌকো চলার সময় তার চাঞ্চল্য জাগল। সে শীতের বিকেলের বিবর্ণ ও ধূসরতামাখা আলোয় প্রতিটি চবুতরা, ছত্রতল, তীরবর্তী রাস্তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল। নীচু নদীগর্ভ থেকে ওইগুলি দিগন্ত বলে মনে হচ্ছিল। তখন সে উঠে ছইয়ে হেলান দিল। এই সময় গিয়াসুদ্দিন বললেন, বহু বছর পরে লালবাগ এলাম। আহা, কী দৈন্যদশা ঘটেছে! মাঝি-ভাই, 'সাহানগর ঘাট' তো দূরে পড়বে। বরং 'লম্পটের ঘাট' তো আগেই। শফি, কী বলো? শফি আনমনে বলল, হুঁ।

এই লম্পটের ঘাটেই এক গোরা উপদ্রব করত। কাছেই সিপাহিব্যারাক। দেশী সিপাহিরাও মেয়েদের জ্বালাতন করত। সেটাই হয়তো এই নামের কারণ। অথচ কিংবদন্তী অন্যরূপ। ইংরেজ ইতিহাসওয়ালারা কখনও স্বয়ং নবাব সিরাজুদ্দৌলা কখনও তাঁর সেনাধ্যক্ষ মির মদনের লাম্পট্যকে এই ঘাটের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। শফি এতক্ষণে শুনতে পেল, গিয়াসপণ্ডিত ঘাট-বৃত্তান্ত নিয়ে বকবক করছেন। বললেন, তুমি জান? ইতিহাসবহিতে শয়তানরা লিখেছে, মদন নামে এক হিন্দু নবাব সিরাজুদ্দৌলার জন্য স্নানার্থিনী সুন্দরীদের নৌকায় তুলে নিয়ে যেতেন! অরে মূর্খ উজবুকের দল! এ মদন সংস্কৃত ভাষার মদন নয়। উচ্চারণবিকৃতিতে 'মাদান' মদন হয়েছে। মাদান খাঁটি আরবি ওয়র্ড। তোমার আব্বার ন্যায় এক বুজুর্গ পির ছিলেন পারস্যদেশে। তাঁর নাম হজরত মাদান শাহ্। আর বাঙলাপ্রদেশের গ্রামে তুমি মুসলমান-দিগের মধ্যে প্রচুর মদন শেখ দেখবে। তুমি দেওবন্দি আলেম মওলানা মাদানির নাম শুনেছ? শফি আনমনে মাথা নাড়ল। চবুতরা, ছত্রতল, রাস্তা—কেল্লা এলাকার কোথাও সিতারা নেই। পরে ভাবল, কেন সে থাকবে? সে কাল্লু সাতমারের স্ত্রী হলেও খান্দানি নবাববংশজাত কন্যা। সে নির্জন ঘাটে যেতে পারে। এমন জায়গায় তাকে এখন দেখা যাবে কেন? গিয়াসুদ্দিন বললেন, ইংরাজিতে একটি প্রবাদবাক্য আছে না? 'যে কুকুরকে বধ করিতে চাও, তাহার বদনাম রটনা করো!' তুমি ইংরাজিনবিশ। বলো তো বাক্যটি ইংরাজিতে কী? শফি আস্তে বলল, মনে পড়ছে না। সে কেল্লার পূর্বফটকের পাশে বারি চৌধুরীর ঘরখানি লক্ষ করছিল। ঘরখানি বন্ধ। সে তাঁর সামনে কোন্ মুখে দাঁড়াবে, ভাবছিল। গিয়াসুদ্দিন বললেন, সিরাজুদ্দৌলার নামে যথেচ্ছ কুৎসা না রটালে ইংরাজ রাজত্ব কায়েম হত না। তুমি তো এই শহরে ছিলে। লক্ষ করেছ, ওই এক কবর বাদে তাঁর আমলের একটুকু স্মৃতিও কোথাও রাখা হয় নি। অথচ মোতিঝিলে তাঁর খালা (মাসি) এবং খালুর (মেসো) স্মৃতির সবগুলিন বিদ্যমান! কোথায় গেল সুরম্য প্রাসাদ হীরাঝিল? দুঃখ ও পরি-তাপের বিষয়, 'সিইয়ার্-উল-মুতাখ্‌শারিন' কিংবা 'মোজফ্‌ফর্‌নামাহ্‌' বহিদুইখানির প্রণেতাদ্বয় মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজ কর্মচারী। চাটুকার আর স্বার্থপর না হলে হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলার এরূপ কুৎসা কেউ রটাতে পারে না। আমার বক্তব্য নয় যে মুসলমান শাসকমাত্রেই মহৎ নিষ্কলঙ্ক, কিংবা হিন্দু শাসকরাও তদ্রূপ ছিলেন। শাসকচরিত্রে সাধারণ মনুষ্যের দোষগুণ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রস্তাব হল যে, সেই শাসকের ঐতিহাসিক ভূমিকা কী ছিল? ইংরাজ শাসনে নাকি শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছে। অশ্বডিম্ব হয়েছে! গিয়াসুদ্দিন ক্রুদ্ধভাবে বললেন, উহারা ভারতবাসীদিগের হস্তে রেলগাড়ি, বাষ্পীয় পোত প্রভৃতি বিবিধ রঙিন খেলনা তুলিয়া দিয়া মোহাবিষ্ট করিয়াছে! আমরা অতিশয় মূর্খ!

গিয়াসুদ্দিন প্রাক্তন রাজধানী দেখতে-দেখতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, শফির মনে হল একথা। তার বলতে ইচ্ছা হল, মানুষ পা তুলে সরে গেলেই সেখানে ঘাস গজায়, এটাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন উত্তেজিত হওয়া বৃথা। মনুষ্যনির্ম্মীত বস্তুপিণ্ডের ধ্বংস অনিবার্য এবং সেই অভিমানী, ভূলুণ্ঠিত, মনুষ্য-ইজ্জতকে প্রকৃতি তাঁহার স্নেহকরতলে আবৃত করিয়া আব্রু রক্ষার ভান করে। অতএব পরিতাপ অর্থহীন!…

কিছুক্ষণ পরে দুজনে কেল্লাবাড়ির উত্তরফটকে পৌঁছুলেন। সেই সময় শফি বলল, আপনি ফটকে গিয়ে চুল্লু নামে একজনের খোঁজ করুন। আমার কথা বলার দরকার নেই। সে আপনাকে দেওয়ান আব্দুল বারি চৌধুরির কাছে নিয়ে যাবে। যদি চুল্লুকে না পান, ওই পাহারাদের বললেই ওরা আপনাকে চাচাজির বাড়ি দেখিয়ে দেবে। সেখানে রহিম বখশ নামে একজন আছে। চাচাজির সঙ্গে সে দেখা করিয়ে দেবে।

গিয়াসুদ্দীন খুব অবাক হয়ে বললেন, সে কী! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

এখনই আসছি। আপনি চাচাজিকে দেবনারায়ণ-দার চিঠিটি দিয়ে কথাবার্তা বলুন। উনি লালবাগে না থাকলে অগত্যা নৌকোয় গিয়ে অপেক্ষা করবেন। তখন আলোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির হবে।

গিয়াসুদ্দিন স্তম্ভিত মুখে বললেন, কী আশ্চর্য! মনে-মনে বিরক্ত হয়ে বললেন, সত্যিই যুবকটি ছিট-গ্রস্ত। পা বাড়িয়ে ফের মনে-মনে উচ্চারণ করলেন, বদ্ধ উন্মাদ!

শফি অন্ধ ঘোড়ার মতো পা ফেলছিল। নহবত-খানা পেরিয়ে বাঁদিকের মহল্লায় ঢুকে সে চলার গতি কমাল। পিলখানার ঘরগুলির দশা আরও শোচনীয় দেখাচ্ছিল। তখনও আলো আছে, ধূসর রঙের আলো। তার বুক কাঁপছিল, আবেগে আর উৎকণ্ঠায়। এতক্ষণে একটি ইংরেজি প্রবাদ তার স্মরণ হল, 'আউট অব সাইট আউট অব মাইণ্ড!' আর-কোন্ বইয়ে যেন পড়েছিল, যাহাকে ভালবাস, তাহাকে কদাচ চক্ষুর আড়াল করিও না। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চাটুজ্জের বইয়েই কি?

সেই ঘর, সেই বেড়া, সেই পেয়ারাগাছ। কিন্তু এরা কারা? শফি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বারান্দা থেকে কেউ বলল, কৌন হো?

শফি একটু কেশে বলল, কাল্লু আছে?

জীর্ণ কম্বল গায়ে এক বুড়ো এসে বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে বলল, বাবু! কাকে ঢুঁড়ছেন?

কাল্লুকে। পিলখানার সাতমার কাল্লুর বাড়ি না এটা?

বুড়ো বলল, হাঁ! কাল্লু তো একবরষ আগে রোশনিমহল্লা চলে গেসে। থানায় সিপাহির নোকরি করছে। আপ রোশনিমহলেমে যাকে পুছিয়ে, বোল দেগা। এখোন কাল্লু কৈ মামুলি আদমি নেহি।

শফি অবাক হয়ে বলল, কাল্লু পুলিশের চাকরি করছে?

জি হাঁ বাবুসাব! কাল্লু তো ছোটাদেওয়ানসাবকা পাশ নোকরি করত। ছোটাদেওয়ানসাব দোবরষ আগে নোকরি ছোড় কর চলা গেয়া। কাল্লুকো উনহি পুলিশকা নোকরি মিলা দিয়া! তো আপনি কোথা থেকে আসতেছেন বাবুসাব?

শফি জবাব না দিয়ে ফিরে চলল। শীতের সন্ধ্যা নিঝুম হয়ে এসেছে। বাজার এলাকায় নৈঃশব্দ্য।

মিটিমিটি আলো, জড়োসড়ো মানুষজন, একটা এক্কা গাড়ি তার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল এবং কোচোয়ান নিশ্চয় তাকে গাল দিয়ে গেল। রোশনিমহল্লায় পৌঁছে পান্না পেশোয়ারির ঘরটা সে চিনতে পারল। ঘরের সামনে উঁচু চবুতরা ফাঁকা। কিন্তু ঘরের ভেতর কারা লম্ফ জ্বেলে তাস খেলছে। চত্বরটার সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে শফি একটি পুরনো বাস্তবতাকে নিবিড়ভাবে বুঝতে চেষ্টা করল। এইখানে একজন হত্যাকারীর জন্ম হয়েছিল! বাস্তবতাটি রক্তাক্ত এবং শক্তিশালী। শফি চমকে উঠল। লম্ফ হাতে অন্য পাশের ঘরের দরজা থেকে কেউ তাকে প্রশ্ন করছে, কৌন হুঁয়া খাড়া হ্যায় জি?

এ এক বুড়ি। লোলচর্ম। শফি বলল, এখানে কাল্লু সিপাহির বাড়িটা কোথায়?

বুড়ি গলিতে নেমে বলল, উ দেখিয়ে। উও পেড়—দেহ্‌ড়ি, হাঁ—ওহি কাল্লু সিপাহিকা ঘর।

বাড়িটার সামনে গিয়ে শফি বুঝল, কাল্লুর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। দেউড়িওয়ালা একটা বাড়িতে সে আছে। উঠোনে একটা কিসের গাছ। দরজা খোলা, কিন্তু চটের পরদা ঝুলছে। মিয়াসাহেব হয়ে গেছে নবাবি হাতির সাতমার কাল্লু খাঁ পাঠান। শফি চাপাস্বরে ডাকল, কাল্লু! কাল্লু!

আবছা আঁধারে পায়ের শব্দ হল। তারপর চটের পরদার ফাঁকে একটি ছোট্ট মুখ বেরুল। সেই সময় ভেতর থেকে কেউ বলল, কৌন রি? বোল্ দে, সিপাহিসাব ডিবটিমে হ্যায়। থানেমে যানে বোল্ দে।

'সিপাহিসাব!' ওই কণ্ঠস্বর কার? শফি গলা একটু চড়িয়ে বলল, আমি শফিউজ্জামান। সে সিতারার নাম উচ্চারণ করতে পারল না। তার কণ্ঠস্বরে কাঁপন ছিল।

এবার লম্ফের আলো চটের পরদার ওধারে উঁচু থেকে নীচু হয়ে এগিয়ে আসতে-আসতে—কৌন?

শফি। শফিউজ্জামান।

পরদা সরে গেল। লম্ফের আলোয় একটি মুখ, উজ্জ্বল গ্রীবা, বুকে একটি শিশু—প্রশান্ত, কিন্তু নির্লিপ্ত স্ত্রীমুখ। তারপর নীরবতা। তুম্—আপ্, তারপর আপনি বলেই থেমে যাওয়া।

শফি বলল, চিনতে পারছ না, সিতারা? আমি শফি।

এবার সিপাহিবধূ একটু হাসল। তাজ্জব! তুমি এ কেমন হয়ে গেছ, শফিসাব? একদম বাঙ্গালিবাবু! ধুতি-উতি, শার্ট-উর্ট পিন্ধ্‌কার্—কী হয়েছে তোমার? হা খোদা! কার সাধ্য আছে তোমাকে চিহিন্‌বে? আও, আও! অন্দর আও!

শফি চটের পরদা তুলে ঢুকে লম্ফের আলো অনুসরণ করল। সেই সময় দ্রুতদৃষ্টিপাতে বাঁদিকে একটি চালাঘরে গোরু আর ছাগল, ডানদিকে মুরগির দরমা, একপাশে পাতকুয়ো, গোসলখানা আর পায়খানাঘর, লাউগাছের বলিষ্ঠ লতা, পুঁইমাচা, তারপর সামনে চারটি ধাপের ওপর বারান্দায় দুখানি কুরসি দেখতে পেল। কুরসি জীর্ণ, কিন্তু অভিজাত। কারণ একদা তা মখমলে মোড়া ছিল। মখমলের লালিত্য ক্ষয়ে গেছে। টুটাফাটা অংশ সেলাইকরা। সিতারা 'বয়ঠো—বোসো আরামসে' বলে একটি কুরসির দিকে ইশারা করল। চোখের সেই দীপ্তি কই? সুরমার টান আছে। কিন্তু দৃষ্টিব্যাপী ধূসরতা। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেছে। শফি কুরসিতে বসল। মুহূর্তে অনুমান করল, কাল্লু এগুলি কেল্লাবাড়ি থেকে আত্মসাৎ করেছে। দুখানি ঘর। একখানি খোলা। ভেতরে তাকিয়ে শফি আবার অবাক হল। নীচু কড়িকাঠ থেকে একটি কাচের ঝালরদেওয়া সুন্দর ঝাড়বাতি জ্বলছে। এও কেল্লাবাড়ি থেকে আত্মসাৎ! একটি প্রকাণ্ড পালঙ্ক, পুরু গদির ওপর নকশাদার চাদর আর তাকিয়া, ঝুলন্ত কয়েকটি রঙিন সিকেয় কাঁসা-পেতলের বিবিধ তৈজস। শফি দেখল, বছর তিনেক বয়সের সালোয়ার-কামিজপরা মেয়েটির মুখের আদলে সিতারার অতীত ঐশ্বর্য প্রতিফলিত, সে ঘরের মেঝেয় দু-পা ছড়িয়ে বসল এবং সিতারা তার ছোট্ট উরুর ওপর বুকের ঘুমন্ত শিশুটিকে স্থাপন করল। তারপর লম্ফটির সাহায্যে একটি চৌকোনা সুদৃশ্য 'লানটিন' জ্বালল। এও, শফির মনে হল, কেল্লাবাড়ি থেকে আত্মসাৎ। লম্ফটি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে লানটিনটি বারান্দায় এনে সিতারা স্থির ও শান্ত দাঁড়াল। তাকে দেখতে থাকল শফি। পরনে ফিকে নীল কামিজ, শাদা সালোয়ার। শাদা উড়নিতে মাথা এবং বুক ঢাকা। তার দুহাতে অনেকগুলি রেশমি চুড়ি, কিন্তু কবজি থেকে দূরে আঁটোভাবে আটকানো। তার নাকে প্রকাণ্ড নাকছাবি ঝিলমিল করছে। কানে রুপোর মোটা দুটি ঝুমকো। সেই সিতারা! কিন্তু সেই সিতারা নয়। শান্ত, উদাসীন, নির্লিপ্ত। হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলল, চায় পিও। তারপোরে কোথা হচ্ছে।

একদিন এমনি সন্ধ্যারাতে সিতারা তাকে চা খাইয়েছিল। কিন্তু সেই সিতারা নয়। শফি বলল, চা খাব না। তুমি বসো।

সিতারা একটু হাসল।…তুমি মেহমান। চায় পিও। নাশতা-উশতা করো। তারপোরে কোথা।

না।

সিতারা তাকাল। আস্তে বলল, কেনো? আমাকে তুমি এখনো না-পসন্দ্ কর বুঝলাম। তো ঠিক হ্যায়!

শফি হাসবার চেষ্টা করে বলল, সিতারা! তোমার জন্য পান্না পেশোয়ারিকে—

জানি। মালুম করেছিলাম। তুমি আমার ইজ্জতরাখনেওয়ালা! আমি কুছু ভুলি নাই। নেহি ভুলোঙ্গি।

শফি চুপ করে রইল। সিতারাও চুপ করে রইল। একটু পরে শফি মুখ তুলে একটু হাসল।…তুমি বলেছিলে, 'পুরা জওয়ান' হয়ে তোমার কাছে আসতে। মনে পড়ে? কেন বলেছিল সিতারা?

সিতারা হাসল না। নির্বিকার মুখে বলল, হাঁ। তুমি পুরা জওয়ান হয়েছ। পান্না পেশোয়ারির চেহ্‌রা হইয়েছে। লেকিন বাঙ্গালি বাবু হইয়েছ। কী বেপার? তুমি সৈয়দজাদা। পিরসাহাবের খান্দান। কেনো তুমি—

বাধা দিয়ে শফি বলল, তুমি এত রোগা হয়ে গেছ কেন?

সিতারা একথার জবাব দিল না। বলল, ছোটা-দেওয়ানসাব তো নোকরি ছেড়ে চলে গেসে। তুমি কার ঘরে এসেছ?

শফিও একথার জবাব দিল না। বলল, বিড্ডুর খবর কী?

বিড্ডু কালকাত্তা চলে গেসে। নোকরি-উকরি করে।

শফি বলল, কাল্লুভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল না!

সিতারা এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। জেরাসে বয়ঠো! আমি খবর ভেজছি। থানেমে হ্যায় মালুম পড়ে। তোমার কথা মুন্নির আব্বা হরঘড়ি বলে।

মুন্নি কে?

সিতারা ঘরের ভেতর ছোট্ট মেয়েটিকে দেখাল। উও মুন্নি। উসকি বাদ একঠো লড়কা আয়া। বদনসিব! এক মাহিনা জিন্দা থা। উসকা বাদ উও লড়কি। তিন মাহিনা উমর (বয়স)। সিতারা হাসল—আত্মস্থ, জননীর হাসি। তারপর বলল, সিপাহিজী বোল্‌তা 'তিন্নি', আমি বলি 'জানি'। কেনো কি আমার খান্দানে একজন ছিল, জানি বেগম। আংরেজ-লোকের সাথে জঙ্গ করেছিল। আমার দাদিজান তিন্‌হি—জান? আব্বাহজরত জিন্দা থাকলে পুছ করতে।

শফি বলল, চলি সিতারা!

শফি উঠে দাঁড়ালে সিতারা বলল, তুমি—তুম এক আজিব আদমি শফিসাব! জেরাসে ঠাহার যাও—সিপাহিজিকো বোলাতি! তোমার খবর পেলে জরুর আ যাবে! এক মিনট্!

শফি বলল, পরে দেখা হবে।

সে দ্রুত ধাপ বেয়ে নেমে গেল উঠোনে। দরজার চটের পরদা তুলে বেরুনোর সময় একবার ঘুরে উঁচু

বারান্দায় লানটিনের আলোয় একপলকের জন্য স্থির ও ঋজু নারীমূর্তিটিকে দেখল, যেন বা এক বৃক্ষ। শীর্ণ, ফলবতী, তবু লাবণ্যে ঝলোমলো। উহাকে তাই ভালবাসিতে সাধ যায়। 'Even as a tree, Phoebus loved her…' জলদেবী দাফনিকে তাহার প্রেমিক দেবতা বৃক্ষরূপিণী দেখিয়াও প্রেম ত্যাগ করিতে পারেন নাই।…

> ‘দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
> পলক-পলক লোহু চোষে…’

ব্রহ্মপুর আশ্রমে মাঘোৎসবে সেবার প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। আশ্রম এবং এই নতুন গ্রামটি বিশাল নিম্নভূমির উত্তরে উঁচু এলাকায় অবস্থিত। আশ্রম, কাছারি, বিদ্যালয়, আশ্রমিকদের বাসগৃহ—এসবের পিছনে একটি বিস্তীর্ণ বাঁজা ডাঙায় শামিয়ানা খাটিয়ে সভা হয়। জেলার হিন্দু ভদ্রলোক শুধু নন, মুসলমান মিয়ঁারাও এসে জোটেন। চাষাভুষো সর্বশ্রেণীর মানুষ হুজুগের বশে ভিড় করেছিল। জমিদারও এসেছিলেন জনাকতক। তাঁদের সঙ্গে যে পাইকবাহিনী ছিল, তারা লাঠি উঁচিয়ে ভিড় সামলানোর কাজে যোগ দেয়। আগের দিন সদর থেকে একদল সশস্ত্র পুলিশ আসে এবং ক্যামপ পেতে খবরদারি শুরু করে। বোধ করি গুপ্তপুলিশও ঢের ছিল। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নেতৃত্ব আমাকে দিতে চেয়েছিলেন দেবনারায়ণদা। আমার নেতৃত্বের যোগ্যতা নেই। একথা শুনে ক্ষুব্ধ দেবনারায়ণদা হৃদয়নাথ শাস্ত্রীর মধ্যম পুত্র অজয়কে দায়িত্বটি দেন। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়কে দেখে নিরাশ হয়েছিলাম। মাঝারি গড়নের মানুষটি, মুখে দাড়ি, বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা। এই হাজার-হাজার মানুষকে তিনি কী শোনাবেন? বিকেলে বেদমন্ত্র পাঠ এবং ব্রহ্মসংগীতের পর সভায় বক্তৃতা শুরু হল। বড়ো হট্টগোল। তার মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী মঞ্চে দাঁড়ালেন। একটি হাত বরাভয়মুদ্রায় উর্ধ্বে তুলে কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মনে হল, মেঘ গর্জন করে উঠল। ‘ভ্রাতৃবৃন্দ! ভগিনীগণ!’ মুহূর্তে সমস্ত কোলাহল থেমে গেল। মাঝে-মাঝে, একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, চোখ বুজে ফেলছিলাম। অবিকল আমার পিতার কণ্ঠস্বর। সেই আগুনের হলকা, সেই বজ্রধ্বনি, সেই ঐশী বার্তা ঘোষণা! সুললিত আরবি শ্লোকগুলির মতোই হঠাৎ-হঠাৎ সংগীতময় বৈদিক স্তোত্র আবৃত্তি। তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। সূর্য দিগন্তে নেমেছে, তবু বিরামহীন অনর্গল বাক্যস্রোত, যেন ভাঙা বাঁধের পথে বন্যার কল্লোল—না, উপমাটি সঙ্গত হইল না, বন্যা ধ্বংসের স্রোত, আর ইহা যেন সৃজন-প্রবাহ; এবং মুসলমানদের উদ্দেশে উচ্চারিত হল, ‘মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ! পবিত্র কোরাণগ্রন্থে আছে, পরমস্রষ্টা কু-উ-ন্ এই ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। এর অর্থ: হউক। অমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হল। আর আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে আছে, পরমস্রষ্টা ব্রহ্মা উচ্চারণ করলেন ঔং—এই নাদব্রহ্মই সমগ্র সৃষ্টির মূলাধার।’ কাঁধে কার হাত পড়লে ঘুরে দেখি, হাজারিলাল। সে কানে-কানে বলল, এসো। সভা শেষ হতে রাত্তির হবে। ওই দেখো, বিলিতি বাতিগুলিন জ্বালানো হচ্ছে। তার পেছন-পেছন উঠে এলাম। আশ্রম এলাকায় ঢুকে হরিবাবু বললেন, রত্নময়ী এসেছে। গোবিন্দদা কথা রেখেছেন। এসো, সে তোমার সঙ্গে পরিচয়ে উৎসুক। কারণ তোমার বাবার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল—তুমি তো সেসব কথা জান। বললাম, তাকে কোথায় রেখেছ? হরিবাবু জবাব দিলেন না। মন্দিরের পিছনে গিয়ে দেখি স্বাধীনবালা দাঁড়িয়ে আছে। বিরক্তমুখে বলল, এত দেরি কেন? সভা ভাঙলেই মা এসে পড়বে জান না? হরিবাবু শুধু হাসলেন। আমি বললাম, সভা রাত্তির অব্দি চলবে। স্বাধীন বলল, আমি সভায় যাচ্ছি। সে চলে গেল।

সুনয়নীর কুটিরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি ধরে স্বাধীনের বয়সী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শীর্ণ, ছিপছিপে গড়ন। কাঁধে খোঁপা ঝুলছে, পাতাচাপা ঘাসের রঙ তার মুখের। হরিবাবু বললেন, রত্ন! এই তোমার সেই পিরবাবার ছেলে শফি।

রত্নময়ী সুস্পষ্ট উচ্চারণে বলল, আস্‌সালামু আলাইকুম্।

আমি স্তম্ভিত। হরিবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, রত্ন পূর্বজন্মে মুসলমান ছিল। যাই হোক, তোমরা বাক্যালাপ করো। সভা উপলক্ষে বিস্তর ‘টিকটিকির’ উপদ্রব হওয়ার সম্ভাবনা। আমি সভার ভিড়ে গা-ঢাকা দিতে গেলাম। রত্ন, তুমি গোবিন্দদাকে বলবে, যেন কেশবপল্লীতে আমার ঘরে গোপনে তোমাকে নিয়ে যান। কিছু কথা আছে।

হরিবাবু দ্রুত চলে গেলেন। রত্নময়ী নেমে এসে জবাফুলের ঝোপের পাশে দাঁড়াল। তার গায়ে একখানি সবুজ কাশ্মীরি নকশাদার আলোয়ান জড়ানো। খোঁপা খসে গিয়েছিল। আলতো হাতে বেঁধে আমার দিকে তাকাল। কোটরগত উজ্জ্বল দুটি চোখ। ঈষৎ তীক্ষ্ণ নাক হরিবাবুর চেহারার সঙ্গে কোনো মিল নেই। বলল, তাহলে আপনি সত্যিই হিন্দু হয়েছেন?

একটু হেসে বললাম, আমি ধর্ম মানি না। নাস্তিক।

সে আমাকে কেমন দৃষ্টে দেখছিল। মনে হল, আমার গায়ে আঁচ লাগছে। যেন অপ্রকৃতিস্থ চাহনি। একটু পরে তেমনি অপ্রকৃতিস্থ ভঙ্গিতে বলল, আপনার আব্বা আমার জিনটিকে তাড়াতে পারে নি। মাঝে-মাঝে সে আমাকে বিব্রত করে। আমিও ছাড়ি না।

এবার বললাম, আপনার আরবি উচ্চারণ শুনে মনে হল আপনি আরবি জানেন। কোথায় শিখলেন?

রত্নময়ী হাসল। আমার প্রিয় জিনটির কাছে। তাকে যদি দেখতে চান, কৃষ্ণপুরে যাবেন। আপনার দাওয়াত (নেমন্তন্ন) রইল। আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের সঙ্গেও যেতে পারেন। আমার পিতাঠাকুর আপনার আব্বার খুব ভক্ত।

সে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলার পর একমুহূর্ত থেমে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, বাট হি হিজ এ টির‍্যান্ট্। দা স্যাটান হিমসেল্‌ফ্। আই হেট হিম।

ফের স্তম্ভিত হয়ে বললাম, কেন?

হি হ্যাজ কিল্‌ড মাই মাদার। হি লিভস উইথ এ কনকুবাইন—ইউ নো, এ বাইজি!

তার হাবভাবে অপ্রকৃতিস্থতা বাড়ছে লক্ষ করে বললাম, আপনি ইংরেজিও চমৎকার বলেন!

আই ওয়াজ টট্ ইংলিশ বাই অ্যান ইউরেশিয়ান গভরনেস! হার নেম ওয়াজ কেটি—কেটি উডবার্ন। রত্নময়ী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ডু ইউ নো হোয়াই শি হ্যাড লেফ্‌ট্ দা জব? দা ব্রুট জমিনডার ওয়ান্‌স্ অ্যাটেমটেড টু রেপ দা লেডি! আই হেট হিম, হেট হিম! সশব্দে থুথু ফেলল রত্নময়ী।

প্লীজ—

রত্নময়ী তাকাল। পরমুহূর্তে হেসে উঠল।… আমি আরবি ভাষায় বাবাকে গাল দিতাম। এইসব কথাই বলতাম। আপনার আব্বাও এসব শুনেছিলেন। আরবি ভাষায় উপদেশ দিয়েছিলেন, জন্মদাতার কোনো খাতাহ্ (ত্রুটি) নজর করতে নেই। তাঁর সঙ্গে আমার বাহাস্ (তর্ক) হয়েছিল। বলেছিলাম, যিনি গর্ভে আমায় ধরেছেন, তাঁর বুঝি কোনো মূল্য নেই? জানেন? সে কী বাহাস!

আমিও হাসতে-হাসতে বললাম, আর লোকেরা ভাবল বুঝি আপনার জিনটা—

বাধা দিয়ে রত্নময়ী বলল, জিনটা আছে। তাকে আমি দেখতে পাই। তার সঙ্গে কথা বলি। এই যে দেখছেন, আমি কেমন টিপ পরে সেজেগুজে আছি, কেন? তার সঙ্গে দেখা যে-কোনো সময় হতে পারে বলে! সে চায়, আমি সুন্দরীটি সেজে থাকি। আমি সেই মেয়ে—‘দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী / পলক-পলক লোহু চোষে।’ কিছু বুঝলেন?

হুঁ।

ফাহিম্ আইয়্ সা’ইন্?

সরি। আমি আরবি জানি না।

রত্নময়ী রুষ্টস্বরে ভেংচি কেটে বলল, বলছি—কী বুঝলেন ? মুসলমানের ছেলে, পিরের বাচ্চা! বলে—আরবি জানি না !

মুখ গম্ভীর রেখে বললাম, বুঝলাম যে আপনি রাত্তিরে বাঘিনী হয়ে জিনটার রক্ত চুষে খান। কিন্তু বেচারা জিন যে রক্তশূন্য হয়ে মারা পড়বে !

ডোন্ট্ জোক উইথ মি।

বিব্রত হয়ে বললাম, সরি ম্যাডাম ! তারপর এদিক-ওদিক দ্রুত তাকিয়ে নিলাম। হরিবাবু আর স্বাধীন এক পাগলি জমিদারকন্যার পাল্লায় আমাকে ফেলে দিয়ে কেটে পড়ল। একে কিভাবে সামলাই ? সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। গায়ে আলোয়ান নেই। ভীষণ শীত করছে। উত্তরের সভা থেকে উত্তরের হাওয়ায় এখন সমবেত সংগীতধ্বনি ভেসে আসছে।

স্বাধীনবালা এসে বাঁচাল। বলল, মা একেবারে ব্রহ্মস্বাদে আপ্লুত। চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরছে। আমি ভাবলাম, আলো কোথায় আছে—দিদি খুঁজে পাবেন নাকি।

সে সোজা ঘরে ঢুকে শলাইকাঠি জ্বেলে লণ্ঠন ধরাল। ডাকল, দিদি ! হিম লাগবে। ঘরে আসুন। শফিদা, চলে এসো।

বললাম, চলুন ! বড্ড হিম লাগছে।

কিন্তু রত্নময়ী দাঁড়িয়ে রইল। তখন স্বাধীন এসে তাকে টানতে-টানতে ঘরে নিয়ে গেল। আমি বললাম, চলি খুকু !

স্বাধীন বলল, এসো না বাবা ! তোমার এত তাড়া কিসের ?

চাদর নেই দেখছ না ? শীত করছে।

স্বাধীন তার গা থেকে মোটা তাঁতের চাদরটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, নাও, গায়ে জড়াও।

চাদরে নারীর ঘ্রাণ! আমার এ কী বোধশক্তি—পঞ্চেন্দ্রিয় কেন এত তীক্ষ্ণ ? অস্বস্তি, অথচ মোহাবিষ্ট অবস্থা—আমি আক্রান্ত। এই আচ্ছাদন যেন বাঘিনীর মতো পলকে-পলকে আমার রক্ত শুষে নিচ্ছে। ঘরে ঢুকলাম না। দোরগোড়ায় মাটিতেই বসে পড়লাম, জুতো উঠোনে খুলে রেখে এসেছি। স্বাধীন বলল, ওখানে কেন ? এই মোড়ায় বসো।

বললাম, থাক্। আমি প্রকৃতিচর মানুষ।

রত্নময়ী তক্তাপোশে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আমাকে দেখছিল। স্বাধীন কী বলতে যাচ্ছিল আমাকে, রত্নময়ী বলে উঠল, ওঁকে আমি যা ভয় পাইয়ে দিয়েছি ! সে খি খি করে হাসতে লাগল।

স্বাধীন সকৌতুকে বলল, শফিদাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন ! ও কে আপনি জানেন ? দুর্দান্ত বাঘ !

রত্নময়ী হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।…

[ক্রমশ

বনলতা ও হেলেন

শ্রীকান্ত রায়

এক

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন আলেকজানদ্রিয়ার শরীর আর চৈতন্যে, পারিপার্শ্বিক আর কেন্দ্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডে বিধ্বস্ত হেলেনিজমের প্রতি নসটালজিয়া-জনিত বিধুরতা, অতীতের খোঁয়ারি পুরোপুরি কেটে যায় নি, এবং একটি ঐতিহাসিক সন্ধিকালের স্বাভাবিক কুয়াশার ভেতর তখনও অতীতের দেবতারা পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপে যেন নিজেদের অবলুণ্ঠিত ছিন্নভিন্ন মর্ত্যকায়ায় আতুর প্রেতের মতো অমর্ত্য মায়া-ধূপের ঘ্রাণসঞ্চারে মরিয়া তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং তাঁদের সেই গোপন আনাগোনা বন্ধ করতে নব্য খ্রীষ্টীয় পিতারা ওঝাদের দক্ষতায় কুয়াশাভরা অন্ধকারে বাইবেলি ঐশীজ্ঞানের মোমবাতি হাতে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন, সেই গুরুতর সংকটপূর্ণ পটভূমিতে একটি বিতর্কের বিস্ফোরণ ঘটেছিল, যা কৌতুকপ্রদ মনে হলেও একটি জীবন-মরণ লড়াই তৎকালে ; আরও শ দেড়েক বছর পরে সম্রাট জুলিয়ানের চৈতন্যে ওই হেলেনীয় দেবতারা শেষবারের মতো ভর করেন, যতক্ষণ স্থায়ী হোক, নিজেদের পুনরভ্যুত্থান ঘটাতে সমর্থ হন এবং খ্রীষ্টীয় মোমের বাতিগুলো কিছুকালের জন্য ফুৎকারে নিবিয়ে দেন। কিন্তু বিতর্কটি ছিল সত্যিই মজাদার : হোমার মোজেস থেকে টুকেছিলেন, না মোজেস হোমার থেকে টুকেছিলেন ? 'Who plagiarised from whom ?'

এই প্রাচীন বিতর্কটির আলোচনায় ফিনলের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'Claims of priority are common propaganda in all sorts of movements : we have had some remarkable examples in our own day.' (Aspects of Antiquity—M. I. Finley, p. 167, Penguin, 1977). হোমার-মোজেস বিতর্কে উভয় পক্ষের হাতে বাইবেল আদিখণ্ডের জেনেসিস অধ্যায় এবং ইলিয়ড-ওডিসি থেকে উদ্ধৃত

সাক্ষ্যপ্রমাণের পালটাপালট প্রয়োগযোগ্য আয়ুধ ছিল প্রচুর; এ ধরনের তর্কাতর্কিতে তার অভাব থাকে না, সেটা বলা আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দরুনই নিষ্প্রয়োজন। একটি নজির দিই ওই বিতর্ক-সূত্রে: জেনেসিসে আছে 'Dust thou art and to dust thou shall return', এটাই নাকি টুকে হোমার হেকটরের লাসকে 'senseless clay' বলেছিলেন!! সত্যিই, এ ধরনের দ্বন্দ্বে অর্থাৎ টোকাটুকি নিয়ে বিতর্কে 'প্রমাণের' অভাব হয় না! ফিনলে-মহাশয় বলেছেন, এখনও এমনটা ঘটে আসছে। ঠিক তাই। এদেশেও আধুনিক সময়ে রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ জাতক, সংস্কৃত কাব্য—যেমন মেঘদূত, কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা গেছে। সেই কে কারটা টুকেছে, অর্থাৎ প্রায়োরিটির দাবি নিয়ে হইচই। সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস বিষয়ে উনিশ শতকের বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারদের মুখে আমরা 'ডিফিউশনিজম'-তত্ত্বের জয়জয়কার শুনেছিলাম। বিশের শতকে 'অ্যানটি-ডিফিউশনিজম'-তত্ত্ব হিসেবে বিবিধ মেথডলজির ঘোষণা শুনেছি। সামাজিক-নৃবিজ্ঞানীর মুখে শুনেছি স্ট্রাকচারালিজমের কথা, তুলনামূলক মিথলজি আর লোকসংস্কৃতির ব্যাখ্যাকারদের মুখে শুনেছি পলিজেনেসিস-মনোজেনেসিস তত্ত্বের ঘোষণা এবং চমস্কি উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, 'Language is universal'; তাই বর্তমানে আমাদের হাতের কাছে প্রচুর আয়ুধ বিদ্যমান, কোনো হোমার-মোজেস ধরনের স্ফীত বর্ণাঢ্য বেলুন নিমেষে বায়ুশূন্য করার মতো প্রচুর তীক্ষ্ণাগ্র আলপিন মজুত। কিন্তু অন্ধ প্রতীতি, যা গোঁড়ামির নামান্তর, এখনও আদিমতাকীর্ণ মানবচৈতন্যের পূজ্য অমর ভূত। শোভিনিজমও সর্বদা সর্বথা প্রাচীন ফিনিসীয় বেল-জেবাবের মতো অবিনশ্বর এবং হিসটিরিয়া ঘটাতে পটু। এ ছাড়া মানবস্বভাবে স্থিত ষড়রিপুর কোনো-কোনোটি বালকোচিত সারল্যে—যা কিনা অজ্ঞতা-জনিত পরিণাম, শালীনতা লঙ্ঘন করতেও পিছ-পা নয় এবং কখনও বা তা পল্লবগ্রাহী বৈদগ্ধ্যের মুখোস পরেও আসরে নামে।

আশ্চর্য, জীবনানন্দ দাশ মহাশয় লিখেছিলেন, '—আলেকজান্দ্রিয়ার / মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে পড়ে অমায়িক সংকেতের মতো;' এবং কবিতাটির নাম 'নাবিক'। প্রকৃত কবিরা প্রকৃতই নাবিকের মতো দিকভ্রষ্টা বলেই যেন তাঁদের কোনো-কোনো উচ্চারণ ঐতিহাসিক সাধারণ ঘটনাবলীর কোনো-কোনোটিতে গিয়ে ভেড়ে এবং তৎক্ষণাৎ সেই উচ্চারণটিও সংশ্লিষ্ট তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়; বিস্ময়ে ভাবি, তাহলে তিনি জানতেন? এবং 'হাজার দেড়েক' টাকা, 'মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি' খুঁটে যা অর্জিত হয়, ক্ষেত্রবিশেষে মূঢ়তা-জনিত তারিফের প্রতীক হয়েও ওঠে। হাততালি না বাজুক, নিদেন লাভ আত্মশ্লাঘা তো বটেই। হোমার-মোজেস নিয়ে হাস্যকর আলেকজানড্রীয় বিতর্ক মনুষ্যস্বভাবেরই বুঝি নিয়তি-তাড়িত অমোঘ বিধি। জীবনানন্দ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ শালীনতা আর পরিশীলিত ঔদাসীন্যবশে পিছনে-পড়ে-থাকা আলেকজানড্রীয় মোমশিখাগুলিকে 'অমায়িক সংকেতের মতো' দেখেছিলেন। কিন্তু চির-মূঢ় জাত-পতঙ্গেরা সেদিকে ধাবিত হবেই। আর সত্যিই ওই সংকেত অমায়িক ছিল না, এখনও নয়।…

দুই

নাটোরের মেয়ে বনলতা সেন এবং স্পার্টার রানী হেলেনকে কিছুকাল আগে একটি দৈনিকের পাতায় পাশাপাশি দাঁড়াতে দেখা গেছে। এবারও সূত্রধর-রূপী আরেক প্রবীণ আর শ্রদ্ধেয় কবির মুখে প্রাচীন আলেকজানড্রীয় কেচ্ছার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। এ তো ঠিকই, এডগার অ্যালান পোর জন্ম জীবনানন্দ দাশের জন্মের নব্বুই বছর আগে এবং 'To Helen' লেখা হয়েছে 'বনলতা সেন' লেখার, স্বাভাবিকভাবেই, বহু বছর আগে; সন-তারিখের নিখুঁত হিসেব এখানে অবান্তরই। এও ঠিক, বাঙলা সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুসরণে গড়ে উঠেছে, এবং জীবনানন্দের ইংরেজি সাহিত্যে ডিগ্রি ছিল, একই বিষয়ে অধ্যাপনাও করেছেন। সুতরাং তিনি অধমর্ণ হতেও পারেন। হোমার-মোজেস বিতর্কে একইভাবে হোমরকে অধমর্ণ সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন এক অজ্ঞাতনামা লেখক। খ্রীষ্টীয় সন ২০০তে তিনি লেখেন: 'I think you are not ignorant of the fact....that Orpheus, Homer and Solon were in Egypt, that they took advantage of the historical works of Moses........'* এবং এখানে উল্লেখ্য, মোজেস (সাম্প্রতিক গবেষণায় মোজেসকে পৌরাণিক চরিত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে, কারণ শব্দটি মূলত সুপ্রাচীন মিশরীয় ভাষার, অর্থ হল দেবতা) অবশ্যই হোমার-এর পূর্ববর্তী। অর্থাৎ জেনেসিস রচিত হয়েছে ইলিয়াড-ওডিসির বহু আগে। আর 'প্রমাণ' তো ওই 'Senseless clay' কথাটিতে, জেনেসিসে উল্লিখিত 'Dust thou art and to dust thou return'-এর প্রতিধ্বনি!! ঠিক এক ভঙ্গিতে 'বনলতা সেন' কবিতার চারটি শব্দ 'চুল', 'মুখ', 'সমুদ্র' ও 'ভ্রাম্যমাণ'-এর দিকে আঙুল তুলে ১৯৫৯ সালে বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দকে যেন সুনিশ্চিতভাবেই পোর কাছে অধমর্ণ সাব্যস্ত করেছিলেন। আরও কেউ-কেউ মৃদু-স্বরে কথাটি নিয়ে কানাকানি করেছেন। কিন্তু আদত কথাটা হল, এইসব কথা যখন বলা শুরু, তখন জীবনানন্দ বেঁচে নেই। তাঁর ভক্ত আর ব্যাখ্যাকাররাও 'তাতে কী হয়েছে'-গোছের নীরবতা পালন করে আসছেন। বিশেষ করে এই আলেকজানড্রীয় বিতর্কের প্রথম আর প্রধান পক্ষ যখন একথাও বলেছেন, 'জীবনানন্দ তাঁর উত্তমর্ণকে বহুদূরে অতিক্রম করে গেছেন', এটি বস্তুত একটি সরেস পিঠ চাপড়ে দেওয়াও তো বটে।

কেউ যদি বলেন, 'বনলতা সেন' পড়ে তাঁর মনে হয়েছে, 'টু হেলেন' না পড়লে জীবনানন্দ কবিতাটি লিখতেন না বা লিখতে পারতেন না, তাঁকে স্রেফ 'মনে হওয়া'র দরুন রেহাই দিলে একধরনের অবাধ, উচ্ছৃঙ্খল, খামখেয়ালি স্বাধীনতাকে মেনে নেওয়া হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই 'মনে হওয়া' অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে, যদি না তাঁর কাছে সুনিশ্চিত প্রমাণ দাবি করা হয়। কোনো জিনিস কারুর ভালো-লাগা / মন্দ-লাগার ক্ষেত্রে রুচি / মেজাজ এসবের দোহাই দেওয়া হয়। কিন্তু যুক্তিবাদী বিচারে রুচি / মেজাজ ইত্যাদি কৈফিয়ত অতীব ঠুনকো। ভালো-লাগা / মন্দ-লাগার সঠিক কারণ নিশ্চয় কিছু না-থেকে পারে না। কারণ ঢুঁড়ে বের করার জন্য যে মানসিক পরিশীলন আর সমীক্ষণ প্রয়োজন, আসল অভাব তারই। যিনি বলবেন, বনলতার সূত্র হেলেন থেকে পাওয়া, তাঁর কাছে প্রবলভাবে কেন প্রমাণ দাবি করব না? এ দাবি যুক্তিসিদ্ধ জেনেই বুদ্ধদেব বসুকে 'বনলতা সেন' কবিতার চারটি শব্দের দিকে তর্জনী নির্দেশ করতে হয়েছিল। কিন্তু এ যেন সেই 'অচেতন কর্দম' এবং 'ধুলোর মানুষ ধুলোতেই ফিরে যাবে' এ দুইয়ের বিভ্রান্তিকর আর হাস্যকর মিল দেখানো। অ্যালান পোর 'টু হেলেন' কবিতার শুরুতে 'Helen, thy beauty is to me…' এই কথাটির অবিকল প্রতিধ্বনি মনে হবে জীবনানন্দের আরেকটি কবিতা 'মিতভাষণ'-এর শুরুর লাইনটি: 'তোমার সৌন্দর্য নারি,…।' কিন্তু এটির কথা কেউ তোলেন নি। কারণ কী? 'মিতভাষণ' খ্যাতিলাভ করে নি বলেই কি? প্রথম স্তবক দুটিতে 'টু হেলেন' কবিতার ভাবগত মিল খুব স্পষ্ট এবং শব্দপ্রয়োগের অনুষঙ্গ এবং বাক্য-বিন্যাসেও মিল লক্ষ করা যায়। মিল মোটিভে এবং কাঠামোতেও। আংশিক উদ্ধৃতি দিই:

> 'তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন।
> মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে

---

* Mythe et allégorie—Jean Pépin (Aubier, Paris, 1958).

ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে—ধর্মে—নির্বাণে ;
তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি…’

এবার ‘টু হেলেন’ পুরোটাই উদ্ধৃত করা চলে এবং মিলগুলি সত্যিই, বস্তুত, উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে।

Helen, thy beauty is to me
  Like those Nicean barks of yore,
That gently, o'er a perfumed sea,
  The weary, way-worn wanderer bore
  To his own native shore.

On desperate seas long wont to roam,
  Thy hyacinth hair, thy classic face,
Thy naiad airs have brought me home
  To the glory that was Greece
And the grandeur that was Rome.

Lo ! in yon brilliant window niche
  How statue-like I see thee stand,
  The agate lamp within thy hand !
Ah, Psyche, from the regions which
  Are holy land !

পোর কবিতাটিতে ট্রোজান-যুদ্ধের মূল নায়িকা হেলেনসুন্দরীর সৌন্দর্য প্রাচীন গ্রেকো-রোমান সভ্যতারই প্রতীক, এবং সেখানে পৌঁছুনোর আকুতি আছে। Psyche প্রাচীন গ্রীক দেবী, যিনি আত্মার সাকার বিগ্রহ, একটি প্রতিমা। পোর কাছে হেলেন সাইকায় পরিণত। ‘agate lamp’ তার হাতের কাছে। জীবনানন্দের কবিতায় ‘মণিকা-আলো হাতে নিয়ে’ দাঁড়িয়ে থাকা একই দৃশ্যের উদ্ভাসন। ‘অনেক সমুদ্র ঘুরে’ এবং পরবর্তী ‘ক্ষয়ে’ শব্দটি ‘on desperate seas’ এবং ‘yore’ শব্দে একাকার হয়ে ওঠে। ‘brought me home’ এবং ‘আমাদের নিয়ে যায় ডেকে’, ‘I see thy stand’ এবং ‘দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি’, পো-উচ্চারিত গ্রীসের গৌরব এবং রোমের ঐশ্বর্যবিলাস ‘অতীতের দানের মতন’ এই কথাটিতে ব্যক্ত। আবার অতীত শব্দে yore-এর সাদৃশ্য আছে। own native shore-এর চেয়ে ‘শ্রেয়তর বেলাভূমি’ আর কী হতে পারে ? ‘clasic face’ প্রতিব্যঞ্জিত হয় ‘তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভা’য়। ‘on desperate seas’-এর ব্যঞ্জনা ‘মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গে’ও প্রতিধ্বনিত। এসবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, দুটি কবিতারই লক্ষ্যের মিল। তুলনা আরও স্পষ্ট করার জন্য পোর কবিতাটির মোটামুটি একটি ভাবানুবাদ-গোছের অথবা transliteration করা যায় (অধুনা কবিতার ভাষান্তরে transcreation টার্মটি অনেকে প্রয়োগ করতে চাইছেন, যদিও নিজেদের অজ্ঞাতসারে বহুকাল ধরে তাই করা হয়েছে। যেমন, ফিটজিরালডের ওমর খৈয়ামে, কিংবা বুদ্ধদেব বসুর করা বোদলেয়ারে)।

> ‘হেলেন, তোমার সৌন্দর্য সেইসব ক্ষয়াটে পুরনো নিসীয় নৌকার মতো / স্বদেশের উপকূলের দিকে ভেসে যেতে যেতে / সুরভিত সমুদ্রের ওপর / যাদের যাত্রার ক্লান্তি অবশ্রান্ত পর্যটক সহ্য করত শান্তভাবে ॥
>
> সক্ষুব্ধ কত সমুদ্রে দীর্ঘ সময় ভেসে বেড়াতে অভ্যস্ত জলজ ফুলের মতো তোমার কুঞ্চিত চুল / ধ্রুপদী মহিমা-মাখা তোমার মুখ / অপ্সরার নিঃশ্বাসের মতো তোমার নিঃশ্বাস / আমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছে গ্রীসের গৌরব আর রোমের ঐশ্বর্যবিলাস ॥
>
> শোনো ! অদূরে উজ্জ্বল কুলুঙ্গিতে / কেমন প্রতিমূর্তির মতো তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি / হাতের কাছে প্রস্থ-মূর্তি-খচিত মণিদীপ / আহা, পবিত্র সেই দেশের নানা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তিলোত্তমা তুমি ॥’

প্রথমেই বলা উচিত, হেলেনের সৌন্দর্যকে নিসীয় নৌকোর সঙ্গে সরাসরি উদ্ভটভাবে তুলনা করা প্রথম পঙ্‌ক্তির উদ্দেশ্য নয়। যাত্রার দৈর্ঘ্য এবং মন্থরতার ব্যাপ্তি, যা সুরভিতও বটে, হেলেনের সৌন্দর্যেরই প্রতিভাস। অ্যালান পোর কবিতাটিতে হোমার তথা হেলেনীয় পুরাণের এবং বিশেষ করে গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতির অনেকগুলি টার্‌ম্‌ আছে এবং তা স্বাভাবিকই ছিল, যেহেতু ইউরোপীয় চৈতন্যের উদ্ভব আর বিকাশ গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতির প্রকর্ষিত ক্ষেত্র থেকেই (বহিরঙ্গে প্রাচ্য থেকে আমদানিকৃত খ্রীষ্টীয় আলখেল্লা সত্ত্বেও)। সেই টার্‌ম্‌গুলির ঈষৎ ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিক, অনিবার্যও বটে। **Nicean barks** : প্রাচীন বিথিনিয়া রাজ্যের নিসিয়া বন্দর-নগরী থেকে যেসব পালের নৌকো দূরের সমুদ্রে যেত, স্বভাবত ফিরতে দেরি হত তাদের। তাই ‘নিসীয় নৌকো’ বলতে দীর্ঘ সময়ের কষ্টকর যাত্রা বোঝাত (হেলেনের কাছে পৌঁছুনো তাকে উদ্ধারের মতোই কষ্টকর প্রলম্বিত একটি যাত্রা)। **hyacinth hair** : সাধারণ অর্থে কোঁকড়া চুল। ফুলের অসংখ্য কলির মতো কেশসজ্জা গ্রীস আর রোমে প্রচলিত ছিল। সেখানকার পুরনো ভাস্কর্যে এটা দেখা যায়। তবে টার্‌ম্‌টির মধ্যে একটি পৌরাণিক কাহিনীর তীব্র ব্যঞ্জনা আছে। বিস্তারিত বৃত্তান্তে না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যাক। তরুণ রাজপুত্র হায়াসিনথাস ছিলেন অ্যাপোলোর প্রিয় (গ্রীসে পুরুষে-পুরুষে প্রেম, যা অধুনা হোমো-সেক্‌স্‌ নামে নিন্দিত, স্বাভাবিক ও প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার ছিল) এবং তাঁর প্রতি বোরিয়াস আর জেফিরাসেরও প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। একদিন অ্যাপোলো আর হায়াসিনথাস ডিসকাস (ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র তুলনীয়) নিক্ষেপের খেলায় মেতে আছেন, এমন সময় বোরিয়াস আর জেফিরাসের চক্রান্তে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। অ্যাপোলোর নিক্ষিপ্ত ডিসকাসটিকে দুই ঈর্ষাকাতর চক্রী প্রণয়ী মন্ত্রবলে ঘুরিয়ে দিলেন হায়াসিনথাসের দিকে। হতভাগ্য রাজপুত্র নিহত হলেন। তাঁর মৃতদেহ গিয়ে পড়ল সমুদ্রে। ক্ষত থেকে উৎসারিত রক্ত পরিণত হল জলজ ফুলে এবং সমুদ্র হল সুরভিত সেই ফুলের গন্ধে। ‘perfumed sea’ এবং ‘hyacinth hair’ এই পৌরাণিক কাহিনীর অনুষঙ্গ বহন করছে। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় টার্‌ম্‌টি আরও একটি তাৎপর্যের দ্যোতক। হায়াসিনথাস ছিলেন ল্যাকোনিয়ার রাজপুত্র। তাঁর স্মৃতিতে প্রতিবছর সেখানে শোকানুষ্ঠান পালিত হত। শোকসংগীত, স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্যদান, শেষে জয়গাথা গাইতে-গাইতে বাড়ি ফেরা—কারণ হায়াসিনথাস অমর হয়েছেন অ্যাপোলোর বরে (হেলেনের ক্ষেত্রেও প্রথমে অসংখ্য হারানোর শোক, শেষে উদ্ধারের জয়গান)। হায়াসিনথ বলতে আমরা বাঙলায় কচুরিপানার ফুল বুঝি, যা ভাসমান। **agate** : সিসিলির Achates নদীতীরে পাওয়া মণিমাণিক্যে তৈরি বামনমূর্তি। শেকসপিয়ার বামন অর্থে কথাটি ব্যবহার করেছেন। **agate lamp** প্রাচীন গ্রীসের উজ্জ্বল কারুকলাভাস্কর্যের নিদর্শন, আবার প্রজ্ঞারও প্রতীক। **Psyche** : গ্রীক পুরাণে বর্ণিত আত্মার সাকার বিগ্রহ, একটি দেবীপ্রতিমা। সাধারণ অর্থে আত্মা।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, কবিতা বোঝবার জন্য এইসব তথ্য কি রসিক পাঠকের জন্য জরুরি ? অবশ্যই জরুরি। কবিতা শুধু শব্দ-শরীরী বললে কিছুই বলা হয় না তার সম্পর্কে। তাকে বাক-প্রতিমাই বলতে হবে। শব্দ জুড়ে বাক্য, বাক্য জুড়ে কবিতার শরীর। কিন্তু শরীরই তো সব নয়, তার আত্মাও আছে। আত্মাই মুখ্য। আমাদের সামনে পড়ে আছে ভাষা, যা সামাজিক জিনিস। ভাষাকে ব্যক্তিগত জিনিসে পরিণত করেন কবি-সাহিত্যিকরা। কবিদের বেলায় এই দায়টা আরও বেশি। মণিকারের দায়। সামাজিক, নিরন্তর ব্যবহৃত এবং অতিব্যবহারে জীর্ণ, পরিবর্তন-

শীল জিনিস-রূপী ভাষা থেকে কবি আহরণ করেন উপযোগী শব্দ, একের পর এক, এবং নির্মাণ করেন তাই দিয়ে তাঁর উদ্দিষ্ট কবিতার প্রতিমা। শব্দ কবির হাতে নতুন অর্থব্যঞ্জনা পায়, অভিনব তাৎপর্য তাকে কবিই দিতে পারেন। ভাষা প্রকৃতিতে পড়ে-থাকা জিনিসের মতো নয়। কিন্তু ভিড়ে-ঠাসাঠাসি, ঘাড়-গুঁজেথাকা, কোনোক্রমে দাঁড়াতে পারা, কখনও পিষ্ট, লুণ্ঠিত, শবের মতোও শব্দের অবস্থা ঘটে সামাজিক ভাষায়। কবিই বার-বার তাদের ত্রাণকর্তা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কবির আহরিত শব্দ, কিংবা শব্দ যখন তিনি টার্‌ম্‌ হিসেবে বেছে নেন, তখনও তাদের সামাজিক-ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ মুছে ফেলা যায় না। শব্দে ধ্বনি আছে স্বতঃসিদ্ধভাবে, যেহেতু শব্দ উচ্চারিত হয় এবং শব্দমাত্রেই ধ্বনিপুঞ্জ—বিভিন্ন মাত্রার। এ-কারণে কবির গাঁথা শব্দমালা বা কোনো শব্দ-জোড়, এমন-কি, কোনো একটিমাত্র শব্দও ধ্বনিমাহাত্ম্যে পৃথক একটি ভাবের জন্ম দিতেও পারে, যা অশ্রুত অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু শব্দের এই ধ্বনিজাত নিজস্ব শক্তি সত্ত্বেও তার সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিচিতি ও অনুষঙ্গ এবং যে-বাকপ্রতিমার অংশ তারা, তারও অনুষঙ্গ মুছে ফেলা অসম্ভব ব্যাপার। এর একটা বড়ো এবং স্থূল কারণ, কবি আর তাঁর পাঠক উভয়ে সামাজিক দ্বিপদ প্রাণী। সমাজে যা কিছু সৃষ্ট হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা সামাজিক জিনিসেই পরিণত হতে বাধ্য। কবি পাখি আর ঘোড়া দুটোই দেখেছেন বলেই পক্ষিরাজ সৃষ্টি করতে পারেন এবং সমাজও তা নতমস্তকে মেনে নেয়। পক্ষিরাজ হয়ে ওঠে একটি অনবদ্য বাকপ্রতিমাও।

স্থূল কারণ, কিন্তু কারণটি বৃহৎ। এর জন্যই এক-ভাষার কবিতা অন্যভাষায় নিজের পুরোটা, সমস্ত অনুপুঙ্খ-অনুষঙ্গ-ব্যঞ্জনা বিশুদ্ধভাবে প্রদর্শনে অসমর্থ। তাই বলা হয় transcreation-এর কথা। তবু কি প্রচলিত ভাষান্তরে অন্তর্নিহিত স্বাদে পাঠক বঞ্চিত থাকে? কিছুটা তো থাকে নিশ্চয়। অথচ মোটামুটি পুষিয়েও যায়, কারণ পৃথিবীতে মানুষনামক প্রাণীর চৈতন্যের উপাদানে সংখ্যাতীত সামান্যতা আছে—তা তারা পরস্পর স্থান-কালগত যত দূরত্বেই বাস করুক। তদুপরি 'Language is universal', চম্‌স্কির এই তত্ত্বটি ফেলনা নয়; রীতিমতো একটি বৈজ্ঞানিক আর্ষোক্তি। কিন্তু কোনো প্রকৃত কবিতা, বিশুদ্ধ কবিতা নিছক ধ্বনিমাহাত্ম্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম। ধ্বনিমাহাত্ম্য একটা উপরি লাভ মাত্র। একভাষার কবিতা অন্যভাষার পাঠককে বোঝবার জন্য অনিবার্যভাবে সেই ভাষা শিখতে হয়, যা সামাজিক জিনিস। আবার শুধু ভাষা শেখাটাও যথেষ্ট নয়। সেই ভাষা-ভাষী সমাজের ইতিহাস-সংস্কৃতি সমস্তটার সঙ্গেও পরিচিতি আবশ্যিক। কারণ ভাষা জিনিসটার সঙ্গে সেই-সেই সমাজের ইতিহাস-সংস্কৃতি ঘনিষ্ঠ এবং অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। কেউ ইংরেজিতে লিখতে-পড়তে পারলে এবং ইংরেজ-সমাজ তথা ইউরোপীয় সমাজের ইতিহাস-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ধর্ম সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত হলেও যে ইংরেজি কবিতা বুঝবেন, এমন ধারণা আরোপ করা চলে না; মূল কথাটা এসবের পরও বাকি থেকে যায়; তিনি সত্যিই কবিতা-পাঠক কি না এবং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, তিনি আজীবন কবিতার সঙ্গী কি না? নিজের ভাষার কবিতার রূপান্তরের এবং কবিতার নিজস্ব প্রবাহের প্রতি তিনি মনোযোগী কি না? এর পরের প্রশ্ন, ইংরেজি ভাষার কবিতার রূপান্তরের এবং পূর্বোক্ত প্রবাহের প্রতিও তিনি মনোযোগী কি না?

এডগার অ্যালান পোর 'টু হেলেন' এবং জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' প্রসঙ্গে কোনো আলোচনায় যেতে হলে ওইসব কথার পরও কথা শেষ হয় না, ফের থমকে দাঁড়াতেই হয়। কোনো কবির কোনো একটি বিশেষ কবিতা পড়েই কি সেই কবিতাটির সমস্ত কিছু বোঝা যায়? যায় না। কারণ কবিতা ফিকশন নয়। একজন ঔপন্যাসিক একটিমাত্র উপন্যাস লিখেই কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করতে পারেন, আর না লিখলেও চলে। কিন্তু একজন কবিকে কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করতে হলে একটি কবিতাই যথেষ্ট নয়। তার কারণ নিছক আকারের হ্রস্বতা নয়; একজন কবির সব কবিতা মিলেই একটি প্রবাহ, একটি ব্যক্তিত্বের চৈতন্যস্রোত বলাই ভালো এবং তাঁর একটিমাত্র কবিতায় সেই প্রবাহ ধরা পড়ে না। উপমা দিয়ে বলা চলে, একটি কবিতা বিশাল আকাশের একটি-মাত্র নক্ষত্রের মতো। কবি যেন সেই আকাশ এবং তাঁকে ধারণ করতে হয় অন্ধকারে 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি'। এই নক্ষত্রমালার সমগ্রতার মধ্যেই নিহিত থাকে একজন কবির প্রকৃত পরিচয় এবং সে-পরিচয়ের সূত্রেই তাঁর কোনো কবিতার সঠিক, খাঁটি, অবিকৃত আত্মার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব হয়। মোদ্দা কথা, কোনো কবিতার প্রকৃত মর্ম,, সেটির প্রতিমাশরীরের প্রত্যেকটি অংশ আর খুঁটিনাটি সাজসমেত ধরা পড়ে তখন, যখন সেই কবিতার কবির সঙ্গে সুদীর্ঘ একটি ভ্রমণ ঘটে গেছে। কোনো ব্যক্তিকে সঠিকভাবে চিনতে-জানতে-বুঝতে হলেও যেমন, ঠিক তেমনি দীর্ঘ, সুদীর্ঘ সহ-বাস আবশ্যিক।

না, কথা এখানেও শেষ করা যাচ্ছে না। আরও কথা থেকে যাচ্ছে। এমন কথা বলা হয়ে থাকে: কোনো কবিতা, কোনো সাহিত্য অথবা শিল্পকর্ম, যা শ্রেষ্ঠ বলে সমাজে স্বীকৃত, তা নাকি যে-যার মতো করে বুঝে নেন। এও বলা হয়: শ্রেষ্ঠ কবিতা, কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, কি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম নাকি যুগে-যুগে নতুন-নতুন ব্যাখ্যা লাভ করে এবং সমকালের প্রবণতার কারচুপি, সময়ের দাবি ইত্যাদি জিনিসও নতুন ব্যাখ্যার পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে। প্রথম বক্তব্যের প্রসঙ্গে সঠিক জবাব হল সেই সুপ্রচলিত প্রবাদ-গল্পটি: একটি পাখির ডাক শুনে ধার্মিকের মনে হয়েছিল 'রাম-সীতা-দশরথ', এক ব্যাপারীর মনে হয়েছিল 'পেঁয়াজ-রসুন-আদরক'…ইত্যাদি। তার মানে, যে-যার মতো করে বোঝাটাও একটা বড়ো ফাঁকি, চালাকিরই নামান্তর, এমন কী, এও সেই রুচি/মেজাজ, ভালোলাগা/মন্দলাগার যুক্তিহীন আর মেকি কৈফিয়ত। এতেও অবাধ, উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আরও একটি প্রবাদ-গল্পের মরাল মনে পড়িয়ে দেয়। ধর্মগুরুর দাড়ি নেড়ে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার সময় সেই যে এক বুড়ি কেঁদে আকুল হয়েছিলেন তাঁর হারানো প্রিয় ছাগলটির কথা মনে পড়ায়! একথা নিশ্চয় স্বীকার্য, কোনো কবিতা বা কবিতার কোনো লাইন পাঠকের মনে বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে কিছু ঝাঁকুনি, কিছু নতুন ব্যঞ্জনার সম্মোহন সৃষ্টি করতেও পারে। কিন্তু এটা যে-যার মতো করে বোঝবার ঘটনা নয়। আসলে কবিতাটির মধ্যে, তার ওই বিশেষ লাইনটির মধ্যেই ঝাঁকুনি দেওয়ার বা নতুন ব্যঞ্জনার সম্মোহন সৃষ্টির শক্তি নিহিত ছিল, এবং বিশেষ একটি মুহূর্তে তা পাঠকের কাছে ধরা দিয়েছে। প্রকৃত কবিতার মধ্যে এই বহুমাত্রিক গভীরতা থাকে। তাকে আবিষ্কার করতে হয় বা আবিষ্কৃত হয়। দ্বিতীয় বক্তব্যের জবাবেও একই কথা বলা চলে। সমকাল/সময় নিজের জোরে কোনো পুরনো কবিতা/সাহিত্য/শিল্পকর্মের নতুন ব্যাখ্যা আরোপ করলেই তা টেঁকে না। মাইকেল রাবণকে হিরো করতে পারেন নি, সে ভিলেনই থেকে গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সেখানে জীবনানন্দের "রূপসী বাংলা"র নতুন তাৎপর্যের উদ্ভাস আসলে ওই কবিতামালার অভ্যন্তরেই নিহিত তাৎপর্য নতুন সময়ের নতুন চেতনায় আবিষ্কৃত হওয়ার ঘটনা। আবার বলছি, শ্রেষ্ঠ কবিতার বহুমাত্রিক গভীরতা থাকে। সেগুলি সময়ে-সময়ে আবিষ্কৃত হয়। তাই বলে সমকালের দাবি বা নতুন চেতনার গাজোয়ারি তৎপরতা বা কারচুপিতে কোনো পুরনো শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে এমন কিছু আরোপ করা বৃথা, যা সেটির অভ্যন্তরে নিহিত ছিল না। আরোপ করলে তা টেঁকে না। গায়ের জোরে চাপানো নতুন ব্যাখ্যা দ্রুত ফেঁসে যায়।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এ-সবই তো চর্বিতচর্বণ,

বহু-আলোচিত। সবারই জানা কথা। কেন আবার নতুন করে বলা, কেনই বা পুনরুক্তি? সবিনয়ে বলতে চাই, পো এবং জীবনানন্দ প্রসঙ্গে টোকাটুকির নব্য আলেকজান্দ্রীয় বিতর্কে এগুলি সামনে আবার রেখেই আলোচনায় বসার প্রয়োজন আছে। কারণ এগুলি কবিতার জন্য মৌলিক পরিপ্রেক্ষিত।···

তিন

প্রয়াত বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ার-প্রসঙ্গে আলোচনার ফুটনোটে লিখে গেছেন: "প্রসঙ্গত উল্লেখ না ক'রে পারছি না যে অ্যালান পো-র কবিতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করেছেন একজন আধুনিক বাঙালি কবি: 'বনলতা সেন' ও 'Helen, thy beauty is to me', এ-দুটি কবিতার সাদৃশ্য স্বয়ংপ্রকাশ। 'চুল', 'মুখ', 'সমুদ্র' ও 'ভ্রাম্যমাণ', এ-সবই আক্ষরিক অর্থে অ্যালান পো-র, কিন্তু, যেমন 'হায়, চিল' কবিতায়, তেমনি এ-ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ তাঁর উত্তমর্ণকে বহুদূরে অতিক্রম করে গেছেন। জীবনানন্দের প্রথম জিত তাঁর নায়িকার স্থানীয়তা আর সমকালীনতায় (ধ্রুপদী সৌন্দর্য পৌরাণিক হেলেনে অপ্রত্যাশিত নয়), এবং দ্বিতীয় ও আরো বড়ো জিত উভয় স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিদুটির আবেগময় আন্দোলনে, যার তুলনায় পো-র শেষ স্তবক বর্ণলিপ্ত পুত্তলীর মতো নিষ্প্রাণ।"*

বাঙলা প্রবাদবাক্যটির কথা মনে পড়ে যায়: গোরু মেরে জুতো দান! রায়টি দেওয়া হয়েছে এমন সময়ে, যখন জীবনানন্দ জীবিত নন। বুদ্ধদেব বসুও এখন জীবিত নন। কিন্তু আধুনিক কবিতা আন্দোলনের পুরোধা, অত্যন্ত প্রভাবশালীও বটে, এমন এক ব্যক্তিত্ব তিনি, তাঁর রায়টি নিমেষে বনলতা সেনের শরীরে হেলেনের কঙ্কাল দর্শন করিয়ে ছেড়েছিল। যেন ওই চারটি শব্দই বনলতার প্রতিমার মূল চারটি গ্রন্থি, ('আক্ষরিক অর্থে' বলতে তাই বোঝায়) যার একচ্ছত্র মালিক পো এবং পোর ওই নিজস্ব, একচেটিয়া মালিকানাসূত্রে লব্ধ চারটি শব্দ খুলে নিলেই যেন হতভাগিনী বাঙালি-কন্যা ভূতলে নেতিয়ে পড়বে!

'প্রত্যক্ষভাবে আহরণ' এই দুটি শব্দকে চ্যালেনজ করা চলে। 'সাদৃশ্য স্বয়ংপ্রকাশ' এবং 'আক্ষরিক অর্থ' এই মোট চারটি শব্দও চ্যালেনজযোগ্য। 'Helen, thy beauty is to me' পোর কবিতাটির প্রথম লাইন এবং কবিতাটির নাম 'To Helen', এই তথ্যগত ত্রুটি অবশ্য ধরছি না। কিন্তু এতে বুদ্ধদেব বসুর অসতর্ক মনোভাব ব্যক্ত রয়েছে। 'বনলতা সেন' বহুপঠিত প্রখ্যাত কবিতা। উদ্ধৃত করতে চাই না। কিন্তু সত্যিই কি 'প্রত্যক্ষভাবে', 'আহরণ', 'সাদৃশ্য', 'স্বয়ংপ্রকাশ', 'আক্ষরিক', 'অর্থে' এই ছয়টি শব্দের ভিত্তি হিসেবে 'চুল', 'মুখ', 'সমুদ্র', 'ভ্রাম্যমাণ' এই চারটি শব্দকে গ্রাহ্য করা যায়?

পোর কবিতাটির কাঠামো, পরিপ্রেক্ষিত, ব্যবহৃত শব্দের অনুষঙ্গ, মূল ভাব তথা লক্ষ্য (মোটিভ) আগেই মোটামুটি আলোচনা করেছি। এবার একে-একে ভিত্তি-চতুষ্টয়কে পরীক্ষা করা যাক। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা', এই লাইনটির 'চুল' শব্দটি কদাচ 'hyacinth hair'-এর চুল নয়। বনলতার 'চুল' নিশ্চয় প্রাচীন আর তাতে ঐতিহাসিক রহস্যময়তা আছে। কিন্তু হেলেনের চুল পৌরাণিক উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত, তাতে রহস্য নেই, যুগপৎ শোক ও বিজয়ের সংকেত মাত্র। প্রতীক বললে আরও ভাল হয়। উল্লেখ্য ঘটনা, পোর সূত্রেই প্রতীকবাদ ইউরোপে হুড়োহুড়ি বাঁধিয়েছিল। আর, কারুর কবিতায় চুল থাকলেই তা আগের কারুর কবিতায় থাকা চুলের প্রতিবিম্ব, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো হাস্যকর। জীবনানন্দের অসংখ্য কবিতায় 'চুল' জীবনানন্দীয় স্বকীয়তা এবং বিশেষ তাৎপর্যে এসেছে। 'ধান-মাখা চুল', 'আমার চোখের পরে আমার মুখের পরে চুল তার ভাসে', 'কত পাটরানীদের গাঢ় এলো চুল / এই গৌড় বাংলার', 'সেইসব ম্লান চুল', 'পরনে ঘাসের শাড়ি—কালো চুল', 'এলোচুল ছড়ায়ে রেখেছে গূঢ় রূপ',—এইসব চুলের পরিসংখ্যান বের করতে কমপিউটার লাগবে। বিদিশার অন্ধকার রাতের মতো চুল জীবনানন্দকে পো থেকে আহরণ করার প্রয়োজন হয় না। যথেষ্ট চুল তিনি দেখেছেন। নারীর চুল তাঁর অনেক কবিতায় এসেছে, অনিবার্যভাবে এবং রহস্যময়তা নিয়ে। 'তোমার মাথার চুলে কেবলি রাত্রির মতো চুল' দেখতে পান যিনি, তিনি বনলতার চুলে 'বিদিশার নিশা' দেখবেন, এটা স্বাভাবিক। প্রবলভাবেই স্বাভাবিক।

'মুখ-এর ব্যাপারেও তাই। মুখ জীবনানন্দের কবিতায় প্রায় সর্বত্র বিশেষ তাৎপর্যে ব্যবহৃত। 'অরুণিমা সান্যালের মুখ', 'তোমার মুখের রূপ কত কত শতাব্দী আমি দেখি না / খুঁজি না', 'শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন', 'তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো', 'তার মুখ মনে পড়ে', 'তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে', 'তোমার মুখের রেখা আজো', 'দেখিবে সে মানুষের মুখ / দেখিবে সে মানুষীর মুখ / দেখিবে সে শিশুদের মুখ', 'মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে / আমার মুখের দিকে', 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', 'এখন শীতের রাতে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে', 'আমি ভালবাসি/ নিস্তব্ধ করুণ মুখ তার এই'; কমপিউটার দরকার মুখের পরিসংখ্যান আর গুণাগুণ নিষ্কাশনের জন্য।

'সমুদ্র' জীবনানন্দের তো প্রায় সমস্ত কবিতার একটি প্রিয় টার্মস্বরূপ। সমুদ্রকে তিনি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন। কেন করেছেন, তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন এবং বাহুল্যও। সমুদ্র জীবনের সফেন অস্তিত্ব তাঁর কাছে। তাই যেমন সমুদ্র, তেমনি হাঁটাহাঁটির ব্যাপারটাও জীবনানন্দের সমস্ত কবিতার অনিবার্য উপাদান; 'ভ্রাম্যমাণ' (পো-কথিত wanderer) হওয়ার জন্য তাঁকে কারুর কাছে হাত পাততে হয় নি। 'ভ্রাম্যমাণ' শব্দটিও তিনি ব্যবহার করেন নি। জীবনানন্দের হাঁটাহাঁটি বস্তুত ইতিহাসের পথে ভ্রমণ। তিনি ভ্রমণ-স্বভাবী। পিয়ার্স লেন থেকে টেরিটিবাজারে পৌঁছতেও তাঁকে 'মাইল-মাইল' হাঁটতে হয়! 'পথ হাঁটা' নাম দিয়ে তাঁকে কবিতা লিখতে হয়। এই হাঁটাহাঁটির সঙ্গে সময় আর ইতিহাস, সারা পৃথিবী আর সমস্ত পুরনো সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ওতপ্রোত জড়িত। 'হাজার বছর ধরে' তিনি 'পৃথিবীর পথে' হাঁটেন। ব্যাবিলনেও হেঁটেছেন। হেঁটেছেন গৌড় থেকে পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন নগরে। বলেন, 'অনেক হেঁটেছি আমি।' তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, তিনি 'একা-একা পথ' হেঁটেছেন। স্থান-কালের দূরত্ব তাঁর সমস্ত সমুদ্র এবং পথহাঁটার সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা।

বুদ্ধদেব বসু-নির্দেশিত শব্দচতুষ্টয় কদাচ 'বনলতা সেনে'রই মূল গ্রন্থি বা ভিত্তি নয়; বরং বলা চলে জীবনানন্দের প্রায় সমস্ত কবিতা-চারিত্র্যের মৌলিক উপাদানেরই অন্তর্ভুক্ত। পোর 'classic face' অনুসরণে বনলতার মুখকে 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' বলা হয় নি, এই সহজ কথাটা বোঝার জন্য 'classic' শব্দটির ইউরোপীয় ঐতিহ্যগত অর্থব্যঞ্জনার প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন ছিল। 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য'—এই কথায় প্রাচীন সৌন্দর্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু একই সঙ্গে বনলতার সামগ্রিক সত্তায় ভারতীয় জন্মান্তরবাদের ধারণা আর অনুপ্রেরণা ক্রিয়াশীল। এই দ্বিতীয় উপাদানটি শুধু 'বনলতা সেন' কেন, জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতায় লক্ষ করা যায়। তীব্র উচ্চারণে বলা চলে, 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের কবিচৈতন্যের কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়, দৈবাৎ কোনো ঘটনা নয়। তাঁর অসংখ্য কবিতায় একই শব্দ-উপাদান, একই পরিপ্রেক্ষিত, প্রায় একই ধরনের কাঠামো এবং একই লক্ষ্য পুনঃপুন

---

* 'বনলতা সেন' নিয়ে বুদ্ধদেব বসু (কবিতা পত্রিকা, চৈত্র, ১৩৪৯) যে আলোচনা করেছিলেন, তাতে কিন্তু এসব কথা বলেন নি। হেলেন-আবিষ্কারে তাঁর এত দেরি দেখে অবাক লাগে।

উদ্ভাসিত। ‘হাজার বছর শুধু খেলা করে’ কবিতাতেও সেই ‘বনলতা সেন’কে আমরা দেখতে পাই। নাটোরে নয়, পিরামিডের দেশেও একই নামে।

‘To Helen’ তাহলে কিভাবে ‘বনলতা সেনে’র উত্তরণ হয়? কোন্ যুক্তিতে ‘প্রত্যক্ষভাবে আহরণ’ করার কথা বলা হয়? শুধু চারটি শব্দের মিলই কি যথেষ্ট? তাহলে তো পৃথিবীর সমস্ত কবি পরস্পরের কাছে ‘প্রত্যক্ষভাবে আহরণ’ করে প্রত্যেকেই স্বকীয়তাহীনভাবে একই সঙ্গে ‘উত্তমর্ণ’ ও ‘অধমর্ণ’ হয়ে ওঠেন! এ এক অদ্ভুত রায়! এমন যদি হত, ওই শব্দচতুষ্টয়ের ওপরই একান্তভাবে ‘বনলতা সেনে’র অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তাহলেও কথা ছিল। পোর কবিতাটির, আবার বলছি, কাঠামো-পরিপ্রেক্ষিত-লক্ষ্য এবং সামগ্রিক সত্তা অর্থাৎ শরীর-মন মিলিয়ে জীবনানন্দের কবিতাটির একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। বাক-প্রতিমা হিসেবেও দুটির মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নেই। এক কবির বাক-প্রতিমারূপিণী কোনো কবিতার কিছু শব্দ চিমটেয় ধরে খুবলে তুলে নিয়ে কোনো প্রকৃত কবিকে নিজের উদ্দিষ্ট বাক-প্রতিমাটিকে সাজানোর প্রয়োজন যে হয় না, কারণ তাঁর সামনেই পড়ে আছে নিজদেশের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য এবং আছে ভাষার মতো একটা বৃহৎ সামাজিক জিনিস, যা মানুষের প্রায় জৈব প্রক্রিয়ার শামিল, এই সরল সত্যটা বোঝবার ক্ষমতা বুদ্ধদেব বসু বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের (যাঁরা নিজেরাও বিশিষ্ট কবি) ছিল না, এ একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটে হাজার টাকা রোজগারকারী, পরীক্ষাপাসপ্রত্যাশী সরলমতি ছাত্রদের পদ্যপড়ানে কোনো মাস্টারমশাই-এর যান্ত্রিক চৈতন্যে এটা ধরা না পড়তেও পারে। কিন্তু কবিদের?

‘শ্রাবস্তীর কারুকার্য’ কথাটি ভারতীয় ধ্রুপদী সৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হতে পারি ঠিকই, যদি বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা যায় কথাটিকে। কিন্তু ‘বনলতা সেন’ কবিতায়, আগেই বলেছি, ভারতীয় জন্মান্তরবাদের ব্যঞ্জনা আছে বলেই প্রাচীনতারও ঘ্রাণ আছে এবং ‘শ্রাবস্তীর কারুকার্য’-তে পৌঁছুনোর আগেই ‘বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে’র দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ আছে। এখানে যে-‘ধূসর জগৎ’টি দেখছি, তার মধ্যেই বিদ্যমান ওই ‘শ্রাবস্তীর কারুকার্য।’ জীবনানন্দ ‘ধূসর’ শব্দটিকে বাঙলা ভাষায় নতুন তাৎপর্য দিয়েছেন, আসলে তা আবিষ্কারই করেছেন, এবং তাঁর ধূসরতা, যা জীবনানন্দীয় ধূসরতা নামে খ্যাত, প্রাচীনতার দ্যোতক এবং সময়ের ছাপে বিবর্ণ। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় টার্‌ম্ হিসেবে ‘classic’ শব্দটি একটি চিরকালীন উজ্জ্বলতা, মানুষের চিৎ-প্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ শস্য, পিরামিড অথবা হিমালয়ের তুল্য বিরাট ও সুউচ্চ, অনতিক্রম্য সৃষ্টি—যার দীপ্তির ক্ষয় নেই; তা এমন অনির্বাণ বাতি আর এমন অমোঘ আর কালাতীত সত্য যে, তাকে অমর্ত্য ঐশী বার্তার মর্ত্য-রূপ বলা চলে। ইউরোপীয় চৈতন্যে classic টার্‌ম্‌টি এমনই এক অবুঝ গোঁয়ার্তুমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্ত্যদেশে মধ্য-উনিশ শতকে ক্লাসিসিজমের বিপরীতে রোমানটিসজম যখন তুঙ্গে পৌঁছেছে, তখন ‘ক্লাসিক’ উপাদানসমূহের মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষয় পায় নি, এই অদ্ভুত বৈপরীত্যের প্রবণতা লক্ষণীয়। পো চূড়ান্ত রোমানটিক-স্বভাবী নিঃসন্দেহে, এবং কবিতায় প্রতীকবাদের হিড়িকের সূত্র তিনিই; কিন্তু নিজের কবিতায় মুহুর্মুহু ক্লাসিক নিদর্শনগুলিকে প্রয়োগ করেন (রোমানটিক কবিদের এই স্বভাব তাৎপর্যপূর্ণ)। এ বিষয়টি পৃথকভাবে সবিস্তারে আলোচনাযোগ্য। তবে মোদ্দা কথাটা হল, ইউরোপীয় চৈতন্যে ‘ক্লাসিক’ এখনও অবিনশ্বর মানদণ্ড। তাই পোর ক্ষয়াটে, সময়ের পোড়খাওয়া, শ্লথগতি ও প্রাচীন নিসীয় নৌকোগুলি শেষ পর্যন্ত প্রত্ন-মণিদীপের সামনে উজ্জ্বল হেলেনের উদ্ভাসনে চরিতার্থ হয়, যে-হেলেন নিখিল আত্মার প্রতিমা—Psyche! পক্ষান্তরে বনলতা সেন শেষ পর্যন্ত, হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা এবং সমুদ্র-পরিক্রমার পর, নিতান্তই নাটোরের সাধারণ মেয়েতে আবিষ্কৃত এবং উত্তরিত হয়। পো এবং জীবনানন্দের এই উত্তরণের অমোঘ বৈপরীত্য ‘classic face’ (যা Psyche-তে পরিণত) এবং ‘শ্রাবস্তীর কারুকার্য’-কেও সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বোধের উচ্চারণ হিসেবে সাব্যস্ত করে। তাই প্রথমটি থেকে কিছুতেই ‘আহরণ’-যোগ্য নয় দ্বিতীয়টি। কোনোভাবেই প্রথমটি উত্তমর্ণ এবং দ্বিতীয়টিকে অধমর্ণ বলা চলে না। এমন কিছু বলাটাই অপরাধ হয়ে পড়ে।*

অথচ ‘To Helen’ এবং ‘মিতভাষণ’-কে বরং পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একটা সম্পর্ক অন্বেষণ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এক্ষেত্রে অনেকাংশে ‘এ-দুটি কবিতার সাদৃশ্য স্বয়ংপ্রকাশ’ বলতে পারতেন বুদ্ধদেব বসু। কেন বলেন নি, বোঝা যায় না। বলেছেন জীবনানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাটি সম্পর্কে, যে-কবিতায় জীবনানন্দীয় চৈতন্য অনবদ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।…

চার

বোদলেয়ারের কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনার ফুটনোটে বুদ্ধদেব বসু ‘হায় চিল’ কবিতাতেও জীবনানন্দকে অধমর্ণ সাব্যস্ত করেছেন, যদিও এক্ষেত্রে উত্তমর্ণের নাম করেন নি। কিন্তু কবিতাপাঠক নিমেষে আঁচ করতে পারেন, ইয়েটসের ‘O Curlew’-এর লক্ষ্য। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ইয়েটস আর জীবনানন্দকে জড়িয়েও একটি আলোচনা করেছিলেন (“জীবনানন্দ দাশ”: নিরুক্ত পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩৫০)। এ ধরনের তুলনামূলক আলোচনা এদেশে প্রথাসিদ্ধ এবং রীতিমতো একটি ঐতিহ্যও সৃষ্টি করেছে—যা এখনও বহমান, ভবিষ্যতেও চলবে। আধুনিক সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক গড়নের প্রবণতাহেতু এর ঐতিহাসিক অনিবার্যতাও অনস্বীকার্য। ‘তুলনামূলক সাহিত্য’ নামে একটি পঠন-পাঠনের নব্য বিষয় তো ইতিমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বাঙলা মুলুকে, যতদূর শোনা যায়, বুদ্ধদেব বসুরই উদ্যোগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা-বিষয় হয়ে উঠেছে। জিনিসটিকে কারুর-কারুর পক্ষে ‘বকচ্ছপ’-জাতীয় কিছু মনে হতেও পারে, এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে অসংখ্য মৌলিক প্রশ্নও উত্থাপন করা যায়। কারণ সাহিত্যের স্থান-কাল-পাত্রবিষয়ক ভিত্তি অবধারিত, তা Sui Generis—স্বয়ম্ভূ বস্তু নয়, বিশেষ-বিশেষ দেশ, ঐতিহ্য-সমাজ-সংস্কৃতি-মানসিকতা-দৃষ্টিভঙ্গি-প্রবণতা (তদুপরি অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতও গণ্য করতে হবে) থেকেই সেই-সেই সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যমূলক উদ্ভব ঘটে থাকে; যদিও, আগেই বলেছি, মানুষনামক দ্বিপদ প্রাণীর চৈতন্যে, তার অনুভূতি-বোধ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-চিন্তায় বিশ্বজনীন একটি ঐতিহাসিক সামান্যতা তো আছেই। তাছাড়া মানুষ শেষ পর্যন্ত মানুষই, রক্ত-মাংসে গড়া, নশ্বর জীব। তাই স্থান-কালের দূরত্বের বাইরেও ওই সামান্যতা বিদ্যমান। বস্তুত এই সামান্যতার কারণেই বিভিন্ন দেশের মনুষ্য-চিৎ-প্রকর্ষের শস্যগুলির মধ্যে সাধারণ মিল থাকতে বাধ্য। আবার বিচিত্র বৈপরীত্য থাকতেও বাধ্য, বিশেষ-বিশেষ স্থান-কাল বিশেষ-বিশেষ সামাজিক-ঐতিহাসিক অবস্থার কারণেই। সেই মিল আর সেই বৈপরীত্য আবিষ্কারে তুলনামূলক আলোচনা নিশ্চয় ফলদায়ী। তা ছাড়া ডিফিউশনিজম-তত্ত্বকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা অযৌক্তিক। সভ্যতা-সংস্কৃতিতে লেনদেন স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ‘তুলনামূলক সাহিত্য’ আলোচনা ‘তুলনামূলক মিথলজি’-বিদ্যার মতোই বহু বিভ্রান্তি সৃষ্টিতেও পটু।

---

* আশ্চর্য, জীবনানন্দ বুদ্ধদেব বসুর ‘কঙ্কাবতী’র আলোচনায় লিখেছিলেন: “আরশি, সেরেনাড ও কঙ্কাবতী এই কবিতা তিনটি কঙ্কাবতীর উদ্দেশে। এই কবিতা ক’টির ভিতর থেকে কোনো স্ট্যাঞ্জা ছিঁড়ে বার করে সে-সবের সৌন্দর্য দেখাবার প্রয়োজন বোধ করি না। কারণ এ কবিতাগুলোর সৌন্দর্য এদের ব্যাপ্ত প্রসারের সমগ্রতার ভিতর…” ইত্যাদি। তিনি বুঝতেন।

আলেকজানড্রীয় বিতর্কের বিভ্রান্তিতে বহু ‘অচেতন কর্দম’-কে ‘ধুলোর মানুষ ধুলোতেই যাবে ফিরে’ সাব্যস্ত করতে ব্রতী হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, শেলীর রোমানটিসিজমের কারণ আর জীবনানন্দের রোমানটিসিজমের কারণে ঐক্য সাব্যস্ত, টেনিসনের ‘Lotus Eaters’ আর জীবনানন্দের ‘অবসরের গান’ একই আকাঙ্ক্ষার ফসল প্রতিপন্ন (‘পদ্মভুক’ টারমৃটির সঙ্গে যিশুর দীক্ষাদাতা জনের বৃত্তান্তের বাইবেলি এবং সেমেটিক মিথলজির অনুষঙ্গজাত ঘ্রাণ যে ইউরোপীয় চৈতন্যে অবধারিত, তা বিচার-বিশ্লেষণের তোয়াক্কা করা হয় নি), ইয়েটসের চাঁদ আর জীবনানন্দের চাঁদ কলমের এক খোঁচায় একাকার হয়ে গেছে। ‘হায় চিল’ কবিতার চিলের ‘ডাক বিরহের স্মৃতি আনে’ ইত্যাদি বলার পর সঞ্জয় ভট্টাচার্য ওয়ালটার ডি লা মেয়ারকেও জীবনানন্দের ‘অতীতের গুঞ্জরণের’ সূত্রে একত্র বেঁধে ফেলেন। নজির বাড়িয়ে লাভ নেই। এ ধরনের আলোচনা নিত্য-নিয়মিত বাঙলা ভাষার পত্রপত্রিকায় বল্‌গাহীন ঘোড়ার মতো, বুনো ঘোড়ারই মতো, অথবা কচ্ছ অঞ্চলের রানে নিম্নভূমিতে ছুটন্ত বুনো গাধাগুলির মতো পরিদৃশ্যমান। তাকলাগানোর ক্ষমতা এদের অসাধারণ। কথায়-কথায় এইসব আলোচনায় ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের সঙ্গে বঙ্গজ কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা জড়িয়ে-মড়িয়ে দলাপাকিয়ে কিম্ভূত হয়ে পড়েন এবং এতে এক ধরনের তৃপ্তিও জোটে, যা নিঃসন্দেহে একদা-ইউরোপীয় কলোনি-দেশের দাসমনস্কতা-জনিত হ্যাংওভার ছাড়া কিছু নয়। ইউরোপীয় সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। কোনো বঙ্গজ কবির কবিতা আলোচনায় ইউরোপীয় চৈতন্যের প্রকর্ষজাত সৃষ্টিসমূহের প্রভাবও স্বভাবত উল্লেখ্য এবং তুলনীয় বিষয় হতে বাধা নেই। কিন্তু তারও আগে আবশ্যিক শর্ত হল, পায়ের তলার মাটিটাকে ভালোভাবে জানা আর বোঝা। বিশেষ করে জীবনানন্দের কবিতা-আলোচনায় তো এটা অতি-অতি আবশ্যিক শর্ত, যিনি বাঙলার মুখ দেখার কথা স্পষ্ট করে বলেন বাঙলার যাবতীয় নৈসর্গিক ও বাঙালি-জীবনের অতীত-বর্তমান চৈতন্য-সংক্রান্ত উপাদানসমূহের অনুপুঙ্খময় পরিচিত্রণে এবং তারপর যাত্রা শুরু করেন সারা পৃথিবীর সংকেতগুলির দিকে সমুদ্র, ভূমি ও আকাশের ছায়াপথ ধরে। ‘জোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার চামড়ার উজ্জ্বল’ শাল কিংবা এশিরিয়া (আসিরিয়া), মিশর, বিদিশার রূপসীদের দেখার আগেই তিনি রূপসী বাঙলার মুখ দেখেছিলেন। কবিতারচনার কালানুক্রমিকতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। জীবনানন্দীয় চৈতন্যের বহুমাত্রিক স্তরের ভিত্তিগত স্তরটি এখানেই, বাঙলায়, পায়ের তলার মাটি বলেছি যেটিকে। তাঁর কবিচৈতন্যের জননীস্বরূপা এই স্তর। তাই তাঁর সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি: ‘আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়।’

সমস্যা হল, ঔপনিবেশিক শাসনের নানা পরিণামের এক বৃহৎ পরিণাম এদেশী শিক্ষিত, সংস্কৃতি-অভিমানী, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজের চৈতন্যকে বস্তুত ছিন্নমূল করে রেখেছে—এখনও। তা ছাড়া ঐতিহাসিক নিয়মেই শাসক জাতির সংস্কৃতি শাসিত জাতির মডেল হতে বাধ্য। বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। ছিন্নমূল চৈতন্যের প্রক্রিয়া অনুযায়ী বহু ‘অচেতন কর্দম’ পরিণত হয় ‘ধুলোর মানুষ ধুলোতেই ফিরে যাবে’-তে। ইয়েটসের ‘I would that we were, my beloved, white birds on the foam of the sea’ পরিণত হয় ‘আমি যদি হতাম বনহংস / বনহংসী হতে যদি তুমি’-তে। আইরিশ জলাভূমির সারসটিও উদ্ভটভাবে বাঙলার চিল হয়ে ওঠে!

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ফলে বাঙলার কোমল নিসর্গ, গ্রামীণ জীবন আর পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে নগর-অভিমানী শিক্ষিতের অনভিজ্ঞতার পরিধি এতই সুবিস্তীর্ণ যে, ‘চিল’-নামক সাধারণ পাখিটির সঙ্গে

জড়িত গ্রামীণ চৈতন্যের সূক্ষ্ম অনুষঙ্গগুলি তাঁদের কাছে অপরিচিত। পাড়াগাঁর দুপুরে চিলের ডাকে যে নৈঃসঙ্গ্যবোধ এবং বেদনাময় স্মৃতির গভীরতর জাগরণ ঘটে, তা তাঁদের জানার বাইরে। জীবনানন্দের চিল curlew নয়। বাঙলার চিল, সোনালি ডানার চিল, অসংখ্যবার তাঁর কবিতায় এসেছে নৈঃসঙ্গ্যবোধজনিত বিষাদ আর আতুর স্মৃতির প্রতীক হয়ে। ‘আর সেই সোনালী চিলের ডানা’, ‘আর সে সোনালী চিল ডানা মেলে’, ‘চিল একা নদীটির পাশে’, ‘ক্ষুধিত চিলের মতো চৈত্রের এ অন্ধকার’, ‘সোনালী চিলের মতো উড়ে উড়ে এ কবিতা লেখা / তাহাদের ম্লান চুল মনে ক’রে’, ‘পিপুলের ভরা বুকে চিল নেমে এসেছে কখন,’ ‘চিল উড়ে চলে গেছে’, ‘মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে’, ‘প্রেমিক চিলপুরুষের শিশিরভেজা চোখের মতো’,…থাক্। সত্যিই কমপিউটার প্রয়োজন। এবং প্রয়োজন গ্রামীণ পারিপার্শ্বিকে জন্ম নিয়ে চিলের ডাক শোনা।

চুল, মুখ, সমুদ্র, পথহাঁটা—এসবের মতো চিলও জীবনানন্দের কবিতায় বারবার এসেছে। অনস্বীকার্য কথা, এক কবির কবিতায় অন্য কবির কবিতার বোধ আর উচ্চারণের মিল থাকতেই পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তা প্রভাব বা উত্তমর্ণ-অধমর্ণ সম্পর্কঘটিত, তার মানে নেই।* মানুষ-নামক প্রাণীর ব্যাপারে ঐতিহাসিক সামান্যতা আছে কবি-মানুষের বেলায় সেই সামান্যতা আরও তীক্ষ্ণ, আরও গভীর, আবার আরও স্পষ্ট। দূর মহাসাগরের কোনো দ্বীপের প্রাচীন লোকগাথায় উচ্চারিত একটি বোধের সঙ্গে বৈদিক ঋকে উচ্চারিত বোধের মিল থাকা খুবই স্বাভাবিক। তেমনি স্বাভাবিক কোনো আধুনিক ইউরোপীয় কবির কোনো বিশেষ বোধের সঙ্গে কোনো বাঙালি বাউলের কোনো বিশেষ বোধের মিল। কিন্তু বাঙলার মুখ যে-কবি নিবিড়ভাবে দেখেছেন, চিল তাঁর কাছে অনিবার্যতায় ধরা দিয়েছে। আইরিশ জলাভূমির সারসটিকে দেখে তাঁকে চিলের পেছনে দৌড়তে হয় নি। তেমনি নিজের জীবিকার প্রতি বিতৃষ্ণ, বীতস্পৃহ, বিরক্ত কোনো কবি যখন ‘মৃত সব কবিদের মাংসকৃমি’ খুঁটে ‘হাজার টাকা’ রোজগারের কথা বলেন, তখন ইয়েটসের scholar-দের প্রতি বিরক্তির ‘অনুকরণ’ করার প্রয়োজনই হয় না (অশ্রুকুমার শিকদার মহাশয়ের ‘ইয়েটস ও জীবনানন্দ প্রসঙ্গে’ নিবন্ধে কথাটি দেখা যায়। ‘আশ্চর্য সাদৃশ্যও’ তিনি আবিষ্কার করেন। ফলে আবার সেই গোরু মেরে জুতোদানের মতো সিদ্ধান্ত: ‘সমগ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে কবিদ্বয়ের আত্মীয়তা’ কোনো সান্ত্বনা আনে না)। ‘…অধ্যাপক;—দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিচুটি এই বিদ্রূপ ইয়েটসীয় বিদ্রূপ ‘Bald heads’-এর প্রতিধ্বনি কদাচ নয়। জীবনানন্দের বিদ্রূপের পেছনে তাঁর বাস্তব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল, আমরা বিস্তারিত জানি। তবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সাহিত্য-কবিতা-শিল্পের সমালোচক / আলোচক তথাকথিত পণ্ডিত / অধ্যাপকদের প্রতি সৃজনশীল (ক্রিয়েটিভ) ব্যক্তিত্বের বিরক্তি। (এক বিশিষ্ট বাঙালি ঔপন্যাসিকের রচিত ছড়াটি উল্লেখযোগ্য: ‘দাড়িকে করেন দার্ঢ্য মোচকে করেন মোচক / অধ্যাপনা করেন যিনি তিনিই সমালোচক।’) নিজের জীবিকার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং তথাকথিত অধ্যাপক / পণ্ডিতদের প্রতি সৃজনশীল কবি-ব্যক্তিত্বের বিরক্তি, এই দুটো বোধই জীবনানন্দকে উল্লিখিত পঙ্‌ক্তি লিখতে বাধ্য করেছিল। জীবনানন্দ কী পরিমাণ বিরূপতা আর ব্যঙ্গবিদ্রূপের মুখোমুখি হয়েছিলেন, আমরা সবিশেষ জানি। সজনীকান্ত দাশ মহাশয় তাঁকে ‘গণ্ডার-কবি’ এবং ‘জীবানন্দ নহে’ বলে ক্রমাগত কটূক্তি বর্ষণ করেছিলেন। অশ্লীলতার দায়ে একদা জীবনানন্দের শিক্ষকতার চাকরি গিয়েছিল। তা ছাড়া তাঁর কবিতা সম্পর্কে তাঁরই জীবদ্দশায় প্রায় আড়াই দশকের বেশি সময়ব্যাপী নিন্দা-পিঠচাপড়ানির বিচিত্র

---

* উত্তমর্ণ-অধমর্ণ কথাটা plagiarism কথাটাকেই ছদ্মবেশ পরানো। জীবনানন্দ অ্যালান পো থেকে চুরি করেছেন, বলতে ভব্যতায় বাধে, তাই।

টানাপোড়েনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলোচকদের মধ্যে বেশির ভাগই নিজেরা কবি হওয়া সত্ত্বেও কেউই তাঁর পায়ের তলার মাটি অন্বেষণে ব্রতী হন নি এবং অনবরত ইউরোপীয় কবিকুলের সঙ্গে তাঁকে অনর্থক জড়িয়ে-মড়িয়ে ফেলেছেন— যা ইউরোপীয় শক্তির একদা-কলোনি এই দেশের রীতি এবং এখনও তা সক্রিয়। আলোচনাগুলিতে এখন চোখ বুলোলে সত্যিই অবাক লাগে।*

পাঁচ

সৃষ্টিধর্মী শিল্প এমনই জিনিস, যা নিয়ে অসংখ্য উলটো-সিধে, বাঁকাচোরা, পরস্পর-বিপরীত, যথেচ্ছ, যা-খুশি অনর্গল কথা বলার অপরিমিত সুযোগ আছে। হাতে কলম, সময় এবং ছাপানোর সুযোগ থাকলে তো কথাই নেই। বাঙলা ভাষায় এই অসম্বদ্ধ অতিকথন এবং একনিঃশ্বাসে তাবৎ কালের তাবৎ ইউরোপীয় সৃষ্টিকারদের ধড়-মুণ্ড-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে একটা কিম্ভূত জিনিস তৈরি অত্যন্ত উল্লেখ্য ট্রাডিশনে পরিণত হয়েছে। জীবনানন্দকে বুঝতে বা বোঝাতে গিয়ে এমনটা, সুতরাং, স্বাভাবিকই ছিল। এর মধ্যে একটা পল্লবগ্রাহিতাজনিত ওপর-চালাকি আর গিমিক থাকে। ভণ্ডামি থাকে। 'বনলতা সেনে'র সঙ্গে পোর 'To Helen' কেন, 'Annabel Lee'-কেও মিলিয়ে দেওয়া যায়। কত কবির কত বোধের সঙ্গে আরও কত কবির কত বোধের মিল ঘটানো যায়। জীবনানন্দের পেঁচাটিকে বোদলেয়ারের পেঁচাটিতে, কিংবা জীবনানন্দের বেড়ালটিকে বোদলেয়ারের বেড়ালটিতে মিলিয়ে দেওয়ার মতো অঘটন-ঘটন-পটীয়সী 'প্রতিভা'র অভাব এদেশে নেই। বোদলেয়ার-রবীন্দ্রনাথকেও 'বন্ধনীভুক্ত' করার দুর্মর লোভ ছিন্নমূল দাস-রক্তে স্বাভাবিক, তা 'বিপুল বৈসাদৃশ্য বিষয়ে' যতই 'চিন্তা' থাক না কেন। বোদলেয়ারের 'Les Litanies De Satan' সম্পূর্ণ করে বুঝতে হলে যেমন সংশ্লিষ্ট বাইবেলি তথা সেমিটিক মিথটির সঙ্গে সম্যক পরিচয় পূর্বশর্ত (শয়তান ছিল স্বর্গের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এনজেল), তেমনি 'বনলতা সেন'কে সম্পূর্ণ করে বুঝতে বৌদ্ধ-হিন্দু জন্মান্তরবাদ অপরিহার্য। 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে' জন্মানোর আকাঙ্ক্ষা, 'কমলালেবুর করুণ মাংস' হয়ে 'পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে' আসার সাধেও জীবনানন্দীয় অবচেতনায় নিহিত জন্মান্তরবাদী প্রত্যয় ভিন্ন-ভিন্ন সংকেতে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই কবির সমস্ত উচ্চারণের আদিভূমি ভারতীয় দার্শনিক ধ্যানধারণা। বিভিন্ন সংকেতে সেগুলির প্রাতিভাসিক কায়া পরিদৃশ্যমান। তাঁর নিসর্গলোক কদাচ নিশ্চেতন, দ্বন্দ্বহীন প্রকৃতি নয়। তা মন্ময় প্রকৃতি, যা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী দর্শনের সারাৎসার : সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মং। ব্রাহ্মপরিবারে তাঁর জন্ম, এটা অত্যন্ত উল্লেখ্য বিষয়। ইউরোপীয় চৈতন্য থেকে তাঁকে কোনো বোধ আহরণ করতে হয় নি, প্রয়োজনই ছিল না। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নয়, ব্যাপক ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা নিশ্চয় স্বাভাবিক, ঐতিহাসিক কারণে। কিন্তু 'অনুকরণ', 'অনুসরণ' এসব কথা বলে পিঠ-চাপড়ানো তাঁর মতো বড়ো কবির প্রতি অপমানেরই নামান্তর। সুনির্দিষ্ট প্রমাণহীন সিদ্ধান্ত হঠকারী স্বেচ্ছাচারই।…

---

* দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সাম্প্রতিক বই 'জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত' নিদর্শনগুলি চমৎকার পারিপাট্যে গ্রথিত হয়েছে।

রঘুপতি-চরিত্র :
একটি ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণ

অঞ্জনা গুহ চট্টোপাধ্যায়

১৯২৩ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) সালে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা-কালে রবীন্দ্রনাথ "বিসর্জন" (১৮৯০) নাটকটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন : 'এই নাটকে বরাবর দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়ী করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল, তাঁর চৈতন্য হল, প্রেম হল জয়যুক্ত।'

"বিসর্জন" নাটকে এই যে প্রেম এবং প্রতাপের দ্বন্দ্ব—তার উপলক্ষটা কী? প্রাথমিকভাবে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক যে বলিদানপ্রথার বিরুদ্ধেই এই নাটক—নিষ্ঠুর এক ধর্মীয় প্রথাকে তুলে ধরাই বুঝি এর লক্ষ্য, প্রেম আর প্রতাপের দ্বন্দ্ব বুঝি এই নিয়েই। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয় যে-কোনো পাঠকের কাছেই। সেটা হল—এ নাটকে যে প্রেম আর প্রতাপের দ্বন্দ্ব মন্দিরে বলিদানপ্রথাকে কেন্দ্র করে, তার পাশাপাশি প্রবাহিত জয়সিংহ-চরিত্রকে ঘিরে আরেকটি শক্তিশালী বিরোধ। সেখানেও দ্বন্দ্ব প্রেমের সঙ্গে প্রতাপের। রাজা গোবিন্দমাণিক্য জয়সিংহকে আনতে চায় প্রেমের পথে, বাঁধতে চায় প্রেম দিয়ে ; আর বৃদ্ধ পালকপিতা রঘুপতি তাকে জয় করতে চায় প্রতাপ দিয়ে, বাঁধতে চায় মন্দিরের প্রথাগত সীমানায়। এইভাবে দুটি শক্তি দুদিক থেকে জয়সিংহকে আকর্ষণ করতে থাকে। এই টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয় জয়সিংহের চিত্ত এবং অন্তিমে নিরুপায় আত্মদানে সে সব বিরোধের অবসান ঘটায়। অর্থাৎ নাটকে গোবিন্দমাণিক্য আর রঘুপতির মধ্যে প্রেম আর প্রতাপ নিয়ে যে সংঘর্ষ, তা যেমন মুকুরিত জয়সিংহের মানসিক দোটানায়, তেমনি অন্যদিকে জয়সিংহ-চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে বিরোধ, তার প্রতিফলনও ঘটে জয়সিংহেরই হৃদয়ে। এইভাবে নাটকের সমস্ত সংঘাতের প্রতিবিম্বন ঘটে জয়সিংহ-চরিত্রে। এবং এই দৃষ্টিতে জয়সিংহ-চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায়, রঘুপতিও আর নিছক এক দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর প্রথাপালক শক্তিমদমত্ত ব্রাহ্মণমাত্র থাকে না, তার চরিত্র ভেদ করে জেগে ওঠে এক স্নেহবুভুক্ষু মানুষের স্বরূপ, যে প্রেমকে বাঁধতে চায় প্রভুত্বের নিগড়ে। রঘুপতি-চরিত্রের ট্র্যাজেডির রন্ধ্রপথ এটাই। তার প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষাই তার মারণাস্ত্র বহন করে এনেছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের বিশ্লেষণের ভাষায় : 'নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা বিসর্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আর-এক বিসর্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল।' অর্থাৎ রঘুপতি-চরিত্রের কেন্দ্রভূমি তার রক্ষণশীলতা নয়, মন্দিরের ক্ষেত্রে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্দম আকাঙ্ক্ষাও নয়, তার চরিত্রের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে জয়সিংহের প্রতি আত্ম-অহমিকায় মোড়া এক জটিল সুতীব্র অনুভূতি। পালিত এই পুত্রটি তার সমস্ত অস্তিত্বকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিল, আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার সমস্ত অন্তর।

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ

রঘুপতি-চরিত্রের এই স্নেহকাতর দিকটি প্রায়ই গৌণ হয়ে পড়ে অভিনয়ের ক্ষেত্রে। অভিনয়ের সময় রঘুপতি হয়ে ওঠে এক স্বার্থপর, রক্ষণশীল, ক্ষমতালোভী, নিষ্ঠুর, ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ। তাই অন্তিম দৃশ্যের প্রতিমাবিসর্জনের ঘটনাটি এক উন্মাদের আচরণ বলে প্রতিভাত হয় দর্শকের কাছে—তার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় আবেদনটি হয়ে যায় ব্যর্থ। নাটকটির বেশ কিছু প্রযোজক, নির্দেশক এবং অভিনেতারই বক্তব্য—রঘুপতি-চরিত্রটিকে মঞ্চে দাঁড় করানো রীতিমতো কঠিন। চরিত্রটির মধ্যে এমন কিছু ফাঁক আছে যা নাটকটি পাঠের সময় নজর এড়িয়ে যায়, কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনেতার পক্ষে এই ফাঁকগুলি পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখনই তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় ম্যানারিজম এবং অতিনাটকীয়তার। কাজেই 'ধর্মান্ধ' রঘুপতি নয়, এক 'মানুষ' রঘুপতির চরিত্রকে আরেকটু অভিনিবেশের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 'প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্ব' নাটকে জয়সিংহ-প্রসঙ্গে তার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১ম অঙ্ক;

৩য় দৃশ্যে। অংশটি উদ্ধৃত করে দিই :

জয়সিংহ। কী হয়েছে প্রভু!
রঘুপতি। কী হয়েছে!
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে।
এই মুখে কেমনে বলিব কী হয়েছে!
জয়সিংহ। কে করেছে অপমান?
রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।
জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য! প্রভু, কারে অপমান?
রঘুপতি। কারে! তুমি, আমি, সর্বশাস্ত্র, সর্বদেশ,
সর্বকাল, সর্বদেশকাল-অধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি। মা'-র পূজা-বলি
নিষেধিল স্পর্ধাভরে!
জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য!
রঘুপতি। হাঁ গো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য!
তোমার সকল শ্রেষ্ঠ—তোমার প্রাণের
অধীশ্বর! অকৃতজ্ঞ! পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হতে,
আমা চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য?

জয়সিংহকে কেন্দ্র করে গোবিন্দমাণিক্য আর রঘুপতির বিরোধটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এইভাবে। সরল জয়সিংহ অবশ্য রঘুপতির এই ঈর্ষাকাতর ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে অকপটে জানায় :

জয়সিংহ। প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্র-পানে—দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।

কিন্তু রঘুপতির পীড়িত হৃদয় এত সহজ উত্তরে কেমন করে সন্তুষ্ট হবে! সে নিঃসন্তান বৃদ্ধ। তার জীবনে কোনো বন্ধন নেই। জয়সিংহ তার একমাত্র স্নেহের বন্ধন। সেই স্নেহের সম্পর্কটিকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় প্রভুত্ব দিয়ে। এখানেই রঘুপতি-চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো ভ্রান্তি। কিন্তু অজ্ঞান রঘুপতি সর্বদাই জয়সিংহকে চেয়েছে একান্ত করে, তাকে বহুজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে সে কখনো রাজি হয় নি। তাই বারবার সে দুরন্ত বিরোধিতা করেছে তাদের সঙ্গে যারাই জয়সিংকে ভালোবাসতে চেয়েছে, তার কাছে আসতে চেয়েছে। জয়সিংহ সম্পর্কে তার এই অধিকারবোধ নাটকে অসংখ্যবার ঝলকিত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে। প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের একেবারে শেষে যখন গোবিন্দমাণিক্য বলিদানপ্রথা বন্ধ করে দেবার আদেশ দেয় তখন জয়সিংহ তার আজন্মলালিত বিশ্বাস নিয়ে বিনীতভাবে তার শ্রদ্ধেয় রাজাকে বলে :

জয়সিংহ। একান্ত মিনতি
যুগলচরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্বিত আদেশ। মানব হইয়া
দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি—

ঈর্ষান্বিত রঘুপতি তৎক্ষণাৎ ঝংকার দিয়ে বলে ওঠে—

রঘুপতি। ধিক্।
জয়সিংহ, ওঠো, ওঠো! চরণে পতিত
কার কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান।
মূঢ়, ফিরে দেখ্,—গুরুর চরণ ধরে
ক্ষমা ভিক্ষা কর্।

গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রঘুপতির বিরোধ এভাবে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে। অবশেষে নক্ষত্ররায়ের সঙ্গে যখন ষড়যন্ত্র করে তাকে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করল রঘুপতি, তখন জয়সিংহ আর নীরব থাকতে পারল না। আকুল হয়ে সে গুরুকে প্রশ্ন করল, 'এ কি পাপ!' গুরু তখন তাকে নতুন শিক্ষা দিল। বলল, 'পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা আত্মপর। কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!' রঘুপতি কি তখন জানত কত বড়ো ভ্রান্ত শিক্ষা সে প্রভুত্বের কামনায় উচ্চারণ করল, কত বড়ো ভ্রান্তি, যা তার জীবনের প্রতিটি গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন করে দেবে? জয়সিংহ যখন পুনরায় সংশয়ভরে প্রশ্ন করে : 'বলো প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান মহাদেবী?'

তখন রঘুপতি এই বলে অভিমান করে :

'হায় বৎস, হায়! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি?'

রঘুপতির স্নেহার্ত মন জয়সিংহের ব্যাপারে অত্যধিক স্পর্শকাতর—তার সামান্য সংশয়টুকুও যেন সহ্য করতে পারে না, তাকে আহত করে। এরপরই অতিসূক্ষ্মভাবে নাটকের ভবিষ্যৎ আঘাতের একটা ইঙ্গিত যেন দিয়ে রাখেন নাট্যকার। রঘুপতি যখন জয়সিংহকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চায় যে, 'দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে' তখন জয়সিংহ নিজেই সেই পুণ্য কাজের দায়িত্ব নিতে চায়।

রঘুপতির স্নেহসিক্ত প্রাণ কিন্তু এ প্রস্তাবে মুহূর্তের জন্য আতঙ্কিত হয়ে বলে ওঠে :

সত্য করে বলি, বৎস, তবে। তোরে আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে—তোরে আমি নারিব হারাতে।

সচেতন দর্শকমাত্রেই সেইক্ষণে যেন কেঁপে ওঠে এক অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায়।

জয়সিংহের প্রতি রঘুপতির এই যে আগ্রাসী এক ভালোবাসা, এর সীমারেখার মধ্যে যারাই এসেছে তাদের বিরুদ্ধেই রঘুপতির বিরূপতা ঝলসে উঠেছে। জয়সিংহের মনের ওপর যারাই রেখাপাত করেছে, রঘুপতির তীব্র বিরাগ এবং তীক্ষ্ণ ঈর্ষা তাদের সম্পর্কেই। তাই শুধু গোবিন্দমাণিক্য নয়, অপর্ণাকেও সে কখনো সহ্য করতে পারে নি। ২য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে অপর্ণাকে দেখে রঘুপতি বিরক্তিভরে বলে

দূর হ এখান হতে
মায়াবিনী! জয়সিংহে চাহিস কাড়িতে
দেবীর নিকট হতে, ওরে উপদেবী!

কিন্তু দেবীর কাছ থেকে নয়, জয়সিংহকে তারই বুক থেকে কেড়ে নেবার ভয়ই যে সর্বক্ষণ রঘুপতিকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছে তা স্পষ্ট হয় কিছুপরে ২য় অঙ্ক ৩য় দৃশ্যে, যখন রঘুপতি জয়সিংহকে অকপটে আদেশ দেয় :

দূর করে দাও এই বালিকারে
মন্দির হইতে।—মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক।—দূর করে দাও ওরে!

এবং অনতিবিলম্বে একই দৃশ্যে তৃতীয়বার শুনি আতঙ্কিত রঘুপতির কণ্ঠে—

জয়সিংহ,
কাল নাই মিষ্ট আলাপের! দূর করে
দাও ওই বালিকারে!

দ্বিধান্বিত জয়সিংহ অগত্যা অপর্ণাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। অথচ প্রেমের স্পর্শ তো তার মনেও সত্যের আলোকচ্ছটা ফেলেছে! তাই সংগত কারণেই তার হৃদয়ে ব্যথা বাজে। সাময়িক সেই বেদনাটুকুও ব্রাহ্মণ রঘুপতির দৃষ্টি এড়ায় না; এবং তাকে যুগপৎ ঈর্ষান্বিত এবং ক্ষুব্ধ করে তোলে—

বৎস, তোলো মুখ, কথা কও একবার!
প্রাণপ্রিয়, প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই! আরো
চাস? আমি আজন্মের বন্ধু, দু দণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ?

হৃদয়ভারে ভারাক্রান্ত জয়সিংহ প্রত্যুত্তরে যখন বলে :

থাক প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর। কর্তব্য রহিল শুধু মনে।

তখন রঘুপতির উক্তিটি লক্ষণীয় :

জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে-বলে।

এবার এই নাটকের সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময় দৃশ্যের আলোচনা করব। ৩য় অঙ্কের ৫ম দৃশ্যটি জুড়ে রয়েছে নিদ্রিত ধ্রুবকে সামনে নিয়ে রঘুপতির স্মৃতিচারণ। গভীর রাত্রি, বলির জন্য বালক ধ্রুব প্রস্তুত, শঙ্কিত নক্ষত্ররায় অকারণ বিলম্বে বিচলিত; কেবল রঘুপতি, যে ছিল এই নিষ্ঠুর মারণযজ্ঞের হোতা, সে ওই নিদ্রিত বালক ধ্রুবর মুখে জয়সিংহের আদল পেয়ে রোমন্থনে মগ্ন। জয়সিংহের প্রতি রঘুপতির যে তীব্র অনুভূতি তার আশ্চর্য সংযত, সূক্ষ্ম দ্যোতনা এই দৃশ্যে মেলে। একদিকে গোবিন্দমাণিক্যকে পরাস্ত করার অভীপ্সা, অন্যদিকে জয়সিংহের প্রতি বিপুল মমতা—এ দুয়ের দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান রঘুপতি অতর্কিতে ধরা পড়ে গেল রাজার হাতে। এই দৃশ্যের সূচনাটি তাৎপর্যবাহী।

রঘুপতি। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি করে
কেঁদেছিল নূতন দেখিয়া চারি দিক,
হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তার সেই শিশুমুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

রঘুপতি যে নিষ্প্রাণ নির্মম একটি ভাবমাত্র নয়, সে-ও যে মানবিক স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার জালে বিজড়িত এক ব্যক্তি, তার চমৎকার স্বাক্ষর মেলে এই দৃশ্যে। গোটা নাটকে ক্রূর, স্বার্থপর, ষড়যন্ত্রপ্রয়াসী, ক্ষমতাপ্রিয় এবং শক্তিশালী রঘুপতিকে দেখেছি অনেকবার; কিন্তু এই

একটিমাত্র দৃশ্যে 'ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে' রঘুপতি-চরিত্রের অসংযত আবেগটুকুর দেখা মেলে। সেখানে তাকে পাই এক অসাবধান, শিথিল স্বরূপে, স্মৃতির মেজাজে, নরম এক ভাবুকতায় আচ্ছন্ন। রঘুপতি-চরিত্রের এই দিকটি সহজে নজরে পড়ে না। অথচ এটা তার চরিত্রের পক্ষে যেমনি সত্য, তেমনি জরুরি।

৪র্থ অঙ্কের ২য় দৃশ্যে যাওয়া যাক। দুদিনের প্রাণভিক্ষা পেয়েছে রঘুপতি। অপমানিত ব্রাহ্মণ আবার ছোবল মারার জন্য প্রস্তুত হয়। জয়সিংহকে সে অনুরোধ করে রাজরক্ত এনে দেবার জন্য। কিন্তু জটিলতা পাকে-পাকে জড়ায়। তাই জয়সিংহকে আর সহজে আদেশ করতে পারে না সে। অথচ তার অনুরোধে জয়সিংহের তাৎক্ষণিক সম্মতি উছলে ওঠে না দেখে ব্রাহ্মণের স্পর্শকাতর মনে আঘাত লাগে। অভিমানী স্বরে সে বলে :

বৎস, কেন নিরুত্তর ? গুরুর আদেশ
নাহি আর ; তবু তোরে করেছি পালন
আশৈশব, কিছু নহে তার অনুরোধ ?
নহি কি রে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা ব'লে ? এই দুঃখ,
এত করে স্মরণ করাতে হল ! কৃপা-
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালোবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে। বৎস, তবু নিরুত্তর ? জানু তবে
আরবার নত হোক। কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোটো—তার কাছে নত হোক জানু। পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি।

সংশয়দীর্ণ জয়সিংহ এর উত্তরে পীড়িত হৃদয়ে বলে :

পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে
আর হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব ! যাহা চাহে
সব দিব। সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব।

এবং তখনই দেখা যায় রঘুপতির অধিকারবোধসম্পন্ন ভালোবাসা কত অনায়াসে দেবীকে পর্যন্ত ঈর্ষা করতে উদ্যত হয়। দেবীর প্রতি ঈর্ষা প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে রঘুপতির উক্তিতে :

তবে তাই
হোক। দেবী চাহে, তাই ব'লে দিস। আমি
কেহ নই। হায় অকৃতজ্ঞ, দেবী তোর
কী করেছে ? শিশুকাল হতে দেবী তোরে
প্রতিদিন করেছে পালন ? রোগ হলে
করিয়াছে সেবা ? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন ?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা ? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে ? হায়, কলিকাল ! থাক্ !

রঘুপতি-চরিত্রের চরম জটিলতা, পরম বাস্তবতা এবং চূড়ান্ত চমৎকারিত্ব এখানেই।

এরপর ক্লাইম্যাক্স আসতে দেরি হয় না। ৫ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যে রঘুপতি শঙ্কায়, ব্যাকুলতায়, প্রকম্পিত চিত্তে জয়সিংহের প্রতীক্ষা করে :

যদি বাধা পায়—যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে !

এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রঘুপতি যখন জয়সিংহের শুভাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, ঠিক তখনি ঘটে জয়সিংহের নাটকীয় প্রবেশ এবং মুহূর্তমধ্যে দেবীর চরণে আত্মদান। সেই মুহূর্তে বিভ্রান্ত রঘুপতির উক্তিও লক্ষণীয় :

ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি ! অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক ! তুই আয় !

এ ভাবেই ঘটে যায় রঘুপতি-চরিত্রের নিঃশর্ত আত্মপ্রকাশ। অহমিকা, আত্মাভিমান, দেবতা, ব্রাহ্মণ্যধর্ম—সমস্ত-কিছু নির্মোকের মতো খসে পড়ে। জেগে থাকে শুধু জয়সিংহ ; এবং তার প্রতি রঘুপতির অগাধ ভালোবাসা। রঘুপতি-চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জয়সিংহের প্রতি এই দুর্মর জটিল স্নেহ।

সুতরাং জয়সিংহের অভাবে, তার মৃত্যুশোকে রঘুপতির উক্তি :

কোথাও সে
নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।—আর

অযৌক্তিক ঠেকে না বা উন্মাদের প্রলাপ বলেও মনে হয় না। তাই গুণবতীর 'এইখানে ছিল না কি দেবী ?'

প্রশ্নের উত্তরে রঘুপতি যখন বলে :

দেবী বল
তারে ! এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী,
তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী ? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি
মূঢ় পাষাণের পদে ? দেবী বল তারে !
পুণ্যরক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে।—তখন বোঝা যায়

কত আন্তরিক এই বিশ্বাস এবং হৃদয়ের উৎসমূলে ঘটে গেছে কত আমূল পরিবর্তন। বোঝা যায় ক্ষণপূর্বের 'পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা আত্মপর ? কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ ?' এই উক্তি থেকে কত যোজন দূরে রঘুপতি ছিটকে সরে এসেছে আজ, কী মর্মান্তিক শোকের আঘাতে রঘুপতির এই পরিবর্তন। এভাবে দেখলে রঘুপতি-চরিত্রের এই বিবর্তন আর অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। এবং অভিনয়ের কালে এই দৃষ্টিকোণে ভর করলে চরিত্রটি অনেক যুক্তিসংগত, বিশ্বাসযোগ্য এবং জীবন্ত হয়ে ওঠে।

"বিসর্জন" বহুবার বহুভাবে বহু বিশিষ্ট জনের দ্বারা প্রযোজিত নাটক। কিন্তু সাফল্যের ইতিহাস তার খুবই কম। নাটকটির জটিল আঙ্গিক, জটিল চরিত্র এবং জটিল মনস্তত্ত্ব একদিকে যেমনি আকর্ষণীয়, অন্যদিকে তেমনি দুরভিনেয়। রঘুপতির চরিত্রের এই আলোকে বিশ্লেষণ হয়তো এই দুরভিনেয়তাকে কাটাতে কিছুটা সাহায্য করতে পারে।

শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নয়, "বিসর্জনে"র প্রকাশকালের শতবর্ষের (ইং ১৮৯০-১৯৯০) প্রাক্কালে নাটকটিকে পুনরায় পড়া, বোঝা এবং বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়তো-বা নিতান্ত তাৎপর্যবিহীন নয়।

এপ্রিল ১৯৮৭ সংখ্যায়
কয়েকটি বিশেষ রচনা

পরমাণু-চিন্তা : অন্নদাশঙ্কর রায়
স্বদেশে এবং বিশ্ব জুড়ে মানবসমাজে ক্রমবর্ধমান ধ্বংসাত্মক প্রবণতা
নিয়ে উদ্‌বিগ্ন লেখকের দুশ্চিন্তা—তাঁর আবেদন
মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে।

তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা : অধ্যাপক সুনীলকুমার সেন
তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা : এই দুই ঐতিহাসিক ঘটনা, এবং
এর মধ্যবর্তী সময়ের কৃষক-আন্দোলনের
সামগ্রিক মূল্যায়ন।

দলিত সাহিত্য : বীণা আলাসে
মহারাষ্ট্রের "দলিত"দের সাহিত্যকৃতির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা।

তৃতীয় থিয়েটার এবং বাদল সরকার : অভিজিৎ করগুপ্ত
বাদল সরকারের সঙ্গে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, এবং তথাকথিত
তৃতীয় থিয়েটারের মূল্যায়ন।

গ্রন্থসমালোচনা

সময়ের আর্ত কণ্ঠস্বর

তিলফুলে তিলোত্তমা—বিরাম মুখোপাধ্যায়। নাভানা। কলকাতা ১২। বারো টাকা।
নখে লাল দাঁতে লাল—বিরাম মুখোপাধ্যায়। নবার্ক। কলকাতা ৫৯। বারো টাকা।
নির্বাচিত কবিতা—ঈশ্বর ত্রিপাঠী। নালন্দা প্রকাশনী। বাঁকুড়া। কুড়ি টাকা।
স্থিতাবস্থা ভাঙো—মতি মুখোপাধ্যায়। বিশ্বজ্ঞান। কলকাতা ৯। সাত টাকা।

কবিতার জগৎ বড়ো রহস্যাতুর। কবির ভাবনার পরিমণ্ডলের চাবিকাঠির হদিস সেইসব শব্দের নিবিড়তায় লুকোনো থাকে। পাঠক তা আবিষ্কার করে কৃতার্থ বোধ করে। বাঙলা কবিতার পালাবদলে শব্দের সুর ও সঙ্গতির একটা ভূমিকা আছে। জীবনকে তার বিচিত্র নির্মাণের ঐশ্বর্যের পরকলার ভিতর দিয়ে দেখার ব্যাপারটা কবিতায় বড়ো সার্থক হয়ে ফোটে। কিভাবে শব্দের সোপান বেয়ে সেই চূড়োয় পৌঁছুনো যায় কবি জানেন তার রহস্য, এবং তিনি জানান আলো-আঁধারির সেই সমাচার কবিতার মারফত। কবিতা জীবনের প্রতিবেদন, তার অন্তর্গূঢ় সত্যের উদ্‌ঘাটন। এ-দাবিতে আজকের পাঠকের মন উচ্চকিত হতে পারে। কেননা বহুব্যবহারে এই কাব্যকলারও বুঝি কিছু-কিছু অভিপ্রায় যথার্থভাবে সংবেদ্য হয়ে ওঠে না উপযুক্ত শিল্পীর জাদুদণ্ডের স্পর্শ ব্যতিরেকে। তবু কবিতা কবিতাই। তার কাছে এখনও হাত পাতবার অবসর খোঁজে ক্লান্ত, বিভ্রান্ত, সংশয়বিদীর্ণ হৃদয়। কবিতা যেহেতু মৃত্যুত্তীর্ণ এক মানবিক সংবেদনা।

এই ভূমিকার পশ্চাৎপটে রয়েছে তিন কবির চারটি কবিতাগ্রন্থ। বয়সের দিক দিয়ে বিরাম মুখোপাধ্যায় যতই প্রবীণ হোন, ঈশ্বর ত্রিপাঠী বা মতি মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভুবনের সঙ্গে তাঁর উপলব্ধির জগতের সাদৃশ্য এই যে, তাঁরা সমকালের জীবনেরই ভাষ্যকার। ভাষা ও ভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও কবিতার উচ্চারণে তিনভুবনের সমাহার পাঠকের সামনে এক উজ্জ্বলতা নিয়ে উপস্থিত হয়। তার ব্যাখ্যার ভিন্নতা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু সংবেদনার স্তরে সমান্তরাল প্রতিবেদন আবিষ্কার কঠিন নয়। বিরাম মুখোপাধ্যায় চল্লিশের দশকে নিয়মিত কবিতা লিখে মাঝখানে দীর্ঘদিন নিরুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব ভাষ্যে ‘কবিতা-সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন ও পরিপ্রশ্নে রচনাকর্ম থেকে স’রেও ছিলাম কয়েক বছর—কোনো প্রসন্নতর প্রশান্তির আর্তিতে নয়, টালমাটাল সময়কে স্নায়বিক সখ্যে আত্মস্থ করার তিতিক্ষা-প্রতীক্ষায়।’ এই তিতিক্ষা এবং প্রতীক্ষার ফসল হিসেবে প্রথম প্রকাশিত “তিলফুলে তিলোত্তমা” এবং দ্বিতীয় “নখে লাল দাঁতে লাল”। টালমাটাল সময়কে ধরে রাখার এই অভিপ্রায় থেকেই বিরাম মুখোপাধ্যায় ফিরে আসেন তাঁর নিজস্ব জগতে যেখানে কবিতা ছত্রিশ রাগিণীতে কথা কয়ে ওঠে। কবির আত্মোপলব্ধি আমাদের একথা জানায় : ‘মুখচোরা কৈশোরের মৃদুল লাজুক তিলফুল / মধুপর্কে ডোবানো-আঙুল / ক্ষণিকার কাঁপা-কাঁপা চন্দন-তিলক / কতো ঘাম কতো রক্ত / নিয়তির নৃশংস হিঙ্গুলে / ধুয়ে মুছে সাফ।’ (ছত্রিশ রাগিণী ৪)। এই সিরিজের কবিতাগুলিতে জীবনের রক্তাক্ত প্রচ্ছদ উন্মোচিত হয়। জীবনকে তিনি এভাবেই দেখান। তিনি নিয়ে যান স্মৃতির অলিন্দে। রক্তে তারই নিগূঢ় ছন্দ তোলে ধ্বনি। যদিও তিনি বলেন : ‘ছন্দোরিক্ত মহাকাব্যে গদ্যের গাঁথুনি, / অভ্রংলিহ ভুলের প্রাসাদ ; / ধনধান্যে শূন্য পুঁজি।/ বুদ্ধিমার্গে দ্রাক্ষাকুঞ্জ / হাতছানি রসালো ছায়ার। / গৃহকোণ সাজালেম কাগজের নকল গোলাপে / ভ্রমর কি আসবে ভুলেও?’ (কল্কিপুরাণ)। তাঁর দৃষ্টিতে এ যুগের চিত্র উদ্ভাসিত হয় তার নগ্ন বাস্তবতায় যেখানে ‘কসাইখানার গানে ভরপুর সুরের বাহার।’

কবি সময়কে শল্যচিকিৎসকের নিপুণগভীর তন্নিষ্ঠ আবেগে উন্মোচন করে যখন উচ্চারণ করেন : ‘নষ্ট ভ্রষ্ট বেয়াড়া সময়…। এখন অতুষ্ট এই ছন্নছাড়া সময়ের মুখ, / ফুসফুস ভ’রে আছে কালাচের বিষ / কিংবা দুরারোগ্য আরো ভীষণ অসুখ,’ (আত্মসূক্ত) তখন আমরা তাঁর অমোঘ ইঙ্গিতে সচকিত হয়ে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এই অসুখী সময়কে তিনি শুধু নিরুদ্যম হতাশায় এড়াতে চান না। এর মধ্যেই তিনি এমন কথাও বলেন : ‘দু’একটা লাল ক্যাকটাস / মরুবালু পারে তো ফোটাক।’ বিরাম মুখোপাধ্যায় খুব অনায়াসে এমন ব্যঞ্জনায় ঝলসে ওঠেন। ‘বুর্জোয়া আলোর দম্ভে স্থবির চাঁদের মুখে / ক্রোমিয়মহাসি’ (আর্ত সন্ধ্যার কবিতা)। এই শব্দবিন্যাসের নিপুণতা তাঁর কবিতাকে আলাদা গোত্র দিয়েছে যা সাম্প্রতিক কাব্যভাষা থেকে স্বতন্ত্র এবং যা প্রাক্তনের স্মৃতি জাগরূক করে। অথচ কবিতা তাঁর কাছে সহজ স্বভাব তা নিশ্চিতই ‘ঝলমল ঝিকমিক চালচিত্র নয়। দো-মেটো মাটিতে-যতটা মানানসই হয়—/ আটপৌরে ভাষায় / তিনফুলে তিলোত্তমা এই। মৃন্ময়ী কবিতা’। (তিলফুলে তিলোত্তমা)। কবিকে বুঝতে তাঁর এই উক্তি আমাদের সহায়তা করে।

এক বছরের ব্যবধানে বেরোয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “নখে লাল দাঁতে লাল”। তাঁর কবিতার রূপবদলের ইঙ্গিত এখানে স্পষ্টতা পায়। প্রবীণ কবির বেদনাছড়ানো পঙক্তিগুলো জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে বুকে নিয়ে শব্দময়ী চেতনার শরিক হয়। তিন ভাগে বিভক্ত এই গ্রন্থের পর্বগুলোও ইঙ্গিতধর্মী “মন্ত্র নয় গীতা নয়” “নখে লাল দাঁতে লাল” এবং “মোহিনী অট্টম”। ছত্রিশ রাগিণীর প্রতিফলন এখানেও আছে। এ পর্বের কবিতার ছন্দোময়তাও লক্ষণীয় এবং কবির সংক্ষুব্ধ মনের অভিব্যক্তিতে কবিতাগুলো সমকালীন পারিপার্শ্বিকতার সত্যকে প্রকাশিত করে। নিদারুণ কশাঘাতে তিনি মেকি জীবনচর্যাকে জর্জরিত করেন। ‘উৎকোচে বশীভূত চতুর বিধাতা-’কেও চাবকান। ওজন-করা শব্দ ব্যবহারে তাঁর প্রবণতা কবিতাগুলোকে বাড়তি মাত্রা দেয়। ‘রুগ্ন করতলধৃত বিশ্রুতির আমলকী-আয়ু’র পাশাপাশি তিনি সহজেই লিখতে পারেন ‘ফাটা-চিমনির নিচে চাল্‌শে নজরে’-র মতো মুখের ভাষাও। ছন্দোবদ্ধ রচনায় তিনি যে পারঙ্গম তাঁর দৃষ্টান্ত ‘লুভরে নয়’। (‘গীতাঞ্জলি’র দানো চাকায় গুঁড়িয়ে গেলো কান্নাগুলো / শাপশাপান্ত অর্থবিহীন, ব্যঞ্জনাময় সূক্ষ্মহাসির / বৈদূর্য কী বিচূর্ণিত! দেবযানী গো, লুভরে নয়—)। ‘ক্লারাজেটকিন : কবরে কিছু ফুল’ এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কবির অনুভূতি, উপলব্ধি ও সংবেদনার সঙ্গে ইতিহাসচেতনা মিলিত হয়ে কবিতাটিকে জীবন সত্যের জলন্ত প্রতীক করে তুলেছে। কবিতার তো তাই অন্বিষ্ট। বিরাম মুখোপাধ্যায়ের সেই অন্বেষণ সৎ কবিতা-পাঠককেও সঙ্গী করে নেবে ‘কবিতার তেশিরা প্রিজমে / সমুজ্জল কুশলতা কী-রঙ ছুঁড়বে?’ তা আবিষ্কারের জন্য।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী তাঁর নির্বাচিত কবিতার প্রতিবেদনে বলেন, কবিতা সভ্যতার সব সংকীর্ণতা চূর্ণ করে। পৃথিবীর সব সীমানা ভেঙে দেয়। জানি না কবির এই সৎ এবং সাহসী উচ্চারণে পৃথিবীর সব মলিনতা ধুয়ে-মুছে যাবে কিনা। কিন্তু কবির সঙ্গে আমাদেরও সেই সাধ জাগে বই-কি। ঈশ্বর ত্রিপাঠীর কবিতার প্রাথমিক গুণ তার নিষ্পাপ তেজস্বিতা যার উৎস মানুষ। ঘুরেফিরে তিনি সেইসব মানুষের কথা আমাদের শোনান যারা ‘সর্বদা আমার সঙ্গে হেঁটে যায়। বয়সের ভারে ন্যুব্জ স্মৃতির প্রহরী সেই পাড়াগাঁর নিরক্ষর চাষী’ (স্বদেশ)। ন্না, কোনো জীর্ণ চিত্রকল্পে তাঁর তুষ্টি নেই। তিনি আশেপাশের জীবন থেকে তুলে আনেন অনেক তাজা শব্দচিত্র যা কবির উপলব্ধিতে জারিত হয়ে কবিতায় স্থান পায়। কোনো সুপ্তিমগ্নতা থেকে তাঁর কবিতা রূপায়িত হয় না। একজন সতর্ক সজাগ শিল্পীর প্রখর উপলব্ধিই ভাষা পায় যখন তিনি আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন ‘ক্রমশঃই রিক্ত হচ্ছে, ক্রমশঃই ভ্রষ্ট হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা শব্দের সৌরভ ক্রমশঃই হৃত হচ্ছে বিষাক্ত হাওয়ায়।” (স্বাধীনতা)। ঈশ্বরের কবিতার মধ্যে একটা সরলতা কাজ করে। কখনো-কখনো মনে হয় কবিতাগুলো একটু বেশিই স্বতোৎসারিত। স্রোতের মতো তা বেরিয়ে আসে। কোথাও কোনো উপলাঘাতের চিহ্নও যেন নেই। তাই তাঁর হাত দিয়ে এইসব নিরলংকার পঙক্তি বেরোয় ‘ধর্ম মানে সমগ্রতা, খণ্ড ক্ষুদ্র ঘটনার পিছনে যে অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণ আছে / তাকে উপলব্ধি করা, ধর্মের প্রকৃত অর্থ পূজা নয়, নয় চারু চরণবন্দনা’ (কাঙ্ক্ষিত স্বর্গ)। এগুলো তত্ত্ব হিসেবে গ্রাহ্য, কিন্তু কবিতার শরীর পেয়েছে কি? অথচ কবির এষণায় সরল উক্তিও কাব্যভাষা পায় ‘এখন আমার স্বপ্ন বলতে শুধু একটিই / কবে আমার কণ্ঠস্বর আমার থেকে বড়ো / অনেকগুণ বড়ো হয়ে দাঁড়াবে ওইসব ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে।’ (ইন্দ্রিয় ও স্বপ্ন বিষয়ক)। নির্বাচনেও সম্ভবত তিনি নিজের ওপর সুবিচার করেন নি। কিছু বর্জন এবং কিছু সংযোজনে সংকলনটি প্রতীকী হবার সম্ভাবনা রাখে।

মতি মুখোপাধ্যায়ের কবিতার গোত্র আলাদা। তাঁর কবিতায় বেদনা যেমন আছে, ব্যঙ্গও আছে। তাঁর হাতেও রয়েছে শাব্দিক চাবুক। সমস্ত কিছু অপমানের বিরুদ্ধে কবির স্বগতোক্তি ঝলসে ওঠে চাবুকের শব্দে। তাঁর কবিপ্রকৃতি অন্তরঙ্গ এবং হৃদয়ের অন্তর্গত কথার সঙ্গে মিশে যায় তাঁর রচিত শব্দপঙক্তি। গভীর বিষাদ এবং একাকিত্বের ছায়ায় আপ্লুত হয়ে থাকে তাঁর এক-একটা কবিতা যা প্রকৃত অর্থে আঘাত করার জন্যই তিনি নির্মাণ করেছেন। তিনি বলেন, 'তরুণ বৃক্ষের মতো জেগে ওঠো। প্রয়োজনে উপড়ে তোলো গভীর শিকড়। স্থিতাবস্থা ভাঙো।" (স্থিতাবস্থা ভাঙো)। বুঝতে কষ্ট হয় না কোথাও এক গভীর প্রতিবাদের ঘূর্ণি সত্তাকে আলোড়িত করছে। তাই তাঁর কবিতায় শিকারী কুকুর, রঞ্জিত অস্ত্র, ক্লীবতা ও পাপ, রক্তবস্ত্রদেখা বাইসন, আলবাট্রসের স্মৃতি ইত্যাদি সহজেই উচ্চারিত হতে দেখা যায়। ভিতরের দিকে তাকিয়ে তিনি সেইসব স্বপ্নের পরদা উন্মোচন করতে ভালোবাসেন যা জীবনের গভীর সত্যকে প্রকাশ করে। এ সবই যে অপ্রত্যাশিত চমকপ্রদ কোনো চিত্রকল্পে বা উচ্চারণে পরিবেশিত তা বলা যায় না। কিন্তু যেখানে তিনি পাঠককে সঙ্গে নিয়ে দেখান জীবনের অসামঞ্জস্য ও মূল্যবোধের বিপর্যয় সেখানে মতি-র ভাষা আকাঙ্ক্ষিত সারল্য পায় : 'ডাকবাক্সের মতো হাঁ-করে আছে ক্ষুধা', 'অন্নদাস হে, আমরা সকলেই অন্নদাস' কিংবা 'ভূষুণ্ডীর মাঠের মতো জীবন একা পড়ে থাকে' ইত্যাদি। মতি-র সংবেদনা এই গ্রন্থের কবিতাগুলোকে বিশেষ মূল্য অর্পণ করেছে।

কৃষ্ণ ধর

তেভাগার লড়াই : ফিরে দেখা

রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন—সম্পাদনা ধনঞ্জয় রায়। রত্না প্রকাশন, কলিকাতা। পনেরো টাকা।

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর ছিল তেভাগা আন্দোলনের এক ঝটিকাকেন্দ্র। রংপুরের কয়েকজন মধ্যবিত্ত নেতার স্মৃতিকথা এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে। এই আন্দোলনে যাঁরা শামিল হয়েছিলেন এখন তাঁদের স্মৃতিকথা নিয়ে অরাল হিস্ট্রি তৈরি হচ্ছে। অনেকের মতে, স্মৃতিকথা থেকে এমন তথ্য পাওয়া যায় যা সরকারি দলিলপত্র থেকে জানা দুঃসাধ্য। আন্দোলনের নেতৃত্ব, সংগঠন, দুর্বলতা এবং পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে স্মৃতিকথা সহায়ক।

ধনঞ্জয় রায় -সম্পাদিত বইটি মূল্যবান। যাঁদের স্মৃতিচারণ সংকলিত হয়েছে তাঁরা সকলেই প্রবীণ; একজন ইতিমধ্যে মারা গেছেন। জীবিত নেতাদের মধ্যে মহী বাগচীর লেখা নেই। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরাও অদৃশ্য—যদিও মহিলারা এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরিশিষ্টে কয়েকজন কৃষক কাডারের কথা আছে, যা অশেষমূল্যবান।

"সাবঅলটার্ন্" মতবাদের প্রবক্তারা বলেন, কৃষক আন্দোলন বিশেষ অবস্থায় শক্তিশালী হয়েছে প্রধানত নিম্নবর্গের মানুষদের চাপে; মধ্যবিত্ত নেতারা জঙ্গী আন্দোলনের মুখে বিপর্যস্ত, দিশেহারা। আলোচ্য বইয়ে মধ্যবিত্ত নেতাদের ইতিবাচক ভূমিকা প্রতিভাত। অনেকে বছরের পর বছর গ্রামে বাস করে কৃষকদের আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন, কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। অনুন্নত সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের মধ্যে নিজের থেকে উন্নত চিন্তা গড়ে ওঠে না। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী উন্নত চিন্তার বাহন। বাস্তবকে অতিরঞ্জিত করে লাভ নেই। তেভাগা আন্দোলন গড়ে তুলতে বুদ্ধিজীবী নেতাদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। দেশের দুর্ভাগ্য, এই ধরনের বুদ্ধিজীবী বিরল।

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকা মনে রাখা উচিত। ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগস্ট মুসলিম লীগের আহূত ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবসে কলকাতায় ঘটল বীভৎস দাঙ্গা; তারপর নোয়াখালি আর বিহারের ঘটনা। দৃশ্যের নাটকীয় পরিবর্তন শুরু হল ১৯৪৬ সালের শেষে, ধানকাটার মরসুমে। অন্যান্য জেলার মতো এই পর্বে রংপুরেও তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। একদিকে দেখা গেল, হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, অন্যদিকে কমিউনিসট নেতাদের নেতৃত্ব। নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছিল বিকাশমান। নেতাদের স্মৃতিচারণে রাজবংশী আর মুসলমান কৃষকদের রাজনৈতিক উদ্যোগ গুরুত্ব পেয়েছে। তখন স্থানীয় নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ কৃষক কাডার।

মণিকৃষ্ণ সেনের লেখায় কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। ডিমলার ঘটনার নায়ক জোতদার জাদু মিঞা; ধ্বনি উঠল : 'জাদু মিঞার কাল্লা চাই'। নেতারা জনতাকে শান্ত করে মিছিল সংগঠিত করলেন গ্রামে-গ্রামে। ইতিমধ্যে সৈয়দপুরে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। এই মিছিলের পর রংপুরের কোনো অঞ্চলে দাঙ্গার আগুন জলে নি স্বাধীনতা পর্যন্ত। মিছিলে এসেছেন শত-শত হিন্দু মুসলমান কৃষক। কিন্তু একসঙ্গে এরা খাবে কী করে? ধ্বনি উঠল : 'দাড়ি টিকি ভাই-ভাই, লড়াইয়ের ময়দানে জাতিভেদ নাই।' সেদিন তারা একসঙ্গে খেল। আসন্ন দেশবিভাগের পটভূমিকায় এমনি অনেক ঘটনা মনে দাগ কাটে।

১৯৩৮ সাল থেকে কৃষক-আন্দোলনের ধারাবাহিকতা চোখে পড়ে। হাটে আর মেলায় গণ্ডি বন্ধ আন্দোলন, অর্থকরী ফসল পাটের লাভজনক দরের জন্য প্রচার, বে-আইনি যুগে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা—এসবের পরিণাম ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিসট প্রার্থীদের আংশিক সাফল্য। দুজন কমিউনিসট প্রার্থী পেয়েছিলেন ২৮ হাজার ভোট; দিনাজপুর জেলার মতো শেষ মুহূর্তে একজন প্রার্থীকে সরিয়ে নিলে জয় ছিল সুনিশ্চিত। নির্বাচনের কয়েক মাস পরেই তেভাগা আন্দোলনের শুরু।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ২০০ নেতা আর কর্মী গ্রেফতার হন। দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আর ময়মনসিংহের মতো কোনো প্রতিরোধ-সংগ্রাম রংপুরে ঘটে নি; কিশোরগঞ্জে পুলিসের গুলিতে তিনজন কৃষক আহত হন। অবনী বাগচীর লেখা পড়ে মনে হয়, দমননীতির মুখে পার্টি পশ্চাদপসরণ করে। গণ-আন্দোলন কেন মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে ভেঙে পড়ল, কোনো লেখা থেকেই তা ঠিক বোঝা গেল না। নৃপেন ঘোষ লিখেছেন, তেভাগা আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি; অ্যাটলির ক্ষমতা-হস্তান্তরের ঘোষণা প্রকাশিত না হলে আন্দোলন আরো জঙ্গী হত।

সুনীল সেন

নিম্নবর্গের সশস্ত্র প্রতিরোধ

বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন—সম্পাদনা সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মুনতাসীর মামুন। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৬। পৃ ১০+৪৭০। একশ পঞ্চাশ টাকা।

এই সংকলনে পর-পর আলোচিত হয়েছে—আঠারো-উনিশ শতকে কৃষকবিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র : সিরাজুল ইসলাম; ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০) : রতনলাল চক্রবর্তী; রংপুর কৃষকবিদ্রোহ (১৭৮৩) : রতনলাল চক্রবর্তী; ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ : ভেলাম ফন স্কেন্ডেল; ফরায়েযী ও ওয়াহাবী আন্দোলন : মঈনুদ্দীন আহামদ খান; তুষখালীর কৃষকবিদ্রোহ : বিনয়ভূষণ চৌধুরী; নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১) : মফিজুল্লাহ কবীর; পাবনা বিদ্রোহের স্বরূপ : চিত্তব্রত পালিত; সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (১৯০০-১৯১৮) : মুনতাসীর মামুন; চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন : পূর্ণেন্দু দস্তিদার; নানকর বিদ্রোহ : অজয় ভট্টাচার্য; টংক আন্দোলন : মণি সিংহ; তেভাগা আন্দোলনে কৃষকপ্রতিরোধচরিত্র : কামাল সিদ্দিকী; নাচোলের কৃষকবিদ্রোহ : মেসবাহ কামাল; একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : সৈয়দ আনোয়ার হোসেন; পরিশিষ্ট : বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর।

আমাদের ইতিহাসচর্চার যে ধারা প্রথানুগ, তাতে এমন অনেক তত্ত্ব আর বিশ্লেষণ অনুসরণ করা হয় যা গড়ে উঠেছে গত দু-শ বছরের বোধ আর চর্চাকে কেন্দ্র করে। এদেশে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক যখন ঔপনিবেশিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হওয়ার পথে, দেশী-বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ সমাজপরিবর্তনের প্রশ্নে এমন একটি তত্ত্ব খাড়া করেন যার মূলকথা হল : এই উপমহাদেশে সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে আসছে শান্তিপূর্ণ অহিংস পদ্ধতিতে, আর ভবিষ্যতে যে-কোনো ধরনের পরিবর্তনও আসবে সে পথ ধরেই। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সম্পর্ক যখন অস্ত্রের বলেই আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত, তখনও তাঁরা এই তত্ত্বকে অনড়ভাবে আঁকড়ে থাকেন। ফলে, এই উপমহাদেশে স্বাধীনতালাভের প্রয়াসে তথাকথিত অহিংসার সাধকদের ভূমিকাই উজ্জ্বল

হতে-হতে একমাত্র ইতিহাস হয়ে ওঠে, আর নিম্নবর্গের সশস্ত্র প্রতিরোধ-আন্দোলনগুলির ভূমিকা ধূসর হতে-হতে সহজেই প্রান্তবর্তী অবস্থানে চলে যায়। যেখানে এসব প্রতিরোধ-আন্দোলনের উল্লেখও দেখা যায়, সেখানে কত সহজেই বিদ্রোহীদের পরিচয় দেওয়া হয় "ডাকাত", "দুষ্কৃতকারী" বলে, কোথাও উপজাতীয়দের সংগ্রামের উল্লেখ থাকে "পাগল", "অসভ্য বর্বরদের" খুনখারাপি বলে।

এইসব বুদ্ধিজীবীদের মূল তথ্যসূত্র, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একমাত্র তথ্যসূত্র সরকারি নথিপত্র আর বক্তব্য।

সম্প্রতি, ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক এমন কিছু গবেষক এসেছেন যাঁরা নিম্নবর্গের আন্দোলনের পর্যালোচনায় যুক্তিবাদী তুলনামূলক তথ্যাদি ব্যবহার করে এইসব আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেন। বাংলাদেশেও নিম্নবর্গের সংগ্রামের ইতিহাস আলোচিত হচ্ছে—আলোচ্য সংকলনটি তারই স্বাক্ষর। এটি আনন্দের বিষয়।

বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সীমা, সেই সীমার মধ্যে ঘটিত আন্দোলনগুলিই এই সংকলনে আলোচিত হলেও, এদের প্রভাব ঠিক এই স্থানগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। আলোচনাগুলির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে এই উপমহাদেশের নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিরোধের একটি অবয়ব। স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সত্য যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাপর্ব থেকেই এদেশের সাধারণ মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরোধিতা করে এসেছে। তার স্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে এই সংকলনে আলোচিত আন্দোলনগুলির মধ্যে ; আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সত্য যে, সাতচল্লিশের হস্তান্তরিত স্বাধীনতা কেবল আবেদন-নিবেদন আর অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আসে নি, সশস্ত্র প্রতিরোধ-সংগ্রামেরও ধারাবাহিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে দেশীয় শাসকবর্গও নিম্নবর্গের মৌলিক দাবিগুলি প্রতিরোধ করতে কতটা প্রতিহিংসা আর সশস্ত্র দমন-পীড়নের পথে যেতে পারে, তার উল্লেখ পাই নানকর বিদ্রোহ, টংক আন্দোলন এবং নাচোলের কৃষকবিদ্রোহের পর্যালোচনায়। এবং, জাতিসত্তার বিকাশের পথে মুক্তিকামী মানুষের আন্দোলনকে—পরে যা সশস্ত্র প্রতিরোধের রূপ নেয়—কতটা নির্মমভাবে দমন করতে উদ্যত হতে পারে একটি দেশীয় সরকার, তার প্রমাণ পাই "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ" নামের আলোচনায়। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা আর ভ্রান্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাবে খণ্ডিত দেশের স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নির্বিচার দানবীয় নরহত্যার যে ঘটনা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ঘটে যায়, তার থেকে অনেক নতুন ভাবনা-চিন্তা জেগে ওঠে।

আলোচিত লেখাগুলিকে আমরা দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি। এক, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে যে আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত আন্দোলনগুলি। এই পর্বে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আরেকটি বিষয় হল কমিউনিসট পার্টির দ্বারা সংগঠিত নানকর, টংক, তেভাগা আর নাচোলের আন্দোলন। এখানে উল্লেখযোগ্য, নানকর আর টংক আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন দুজন ব্যক্তি যাঁরা ছিলেন ওই আন্দোলনের সংগঠক আর নেতা। আরো একজন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত পূর্ণেন্দু দস্তিদার আলোচনা করেছেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নিয়ে।

সময়ের ব্যবধানে এই দুই পর্বের আন্দোলনগুলির আলোচনায় দেখা যায়, প্রথম পর্বে যে আন্দোলন ব্যাপ্তি আর বিকাশে ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র ব্রিটিশ শাসনকাল জুড়ে, তার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে শাসকবর্গের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা। পাশাপাশি আরো একটি ছবি আমরা পেয়ে যাই। তা হল, আন্দোলনগুলির প্রতি শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের নিস্পৃহতা কতটা ব্যাপক হতে পারে—তাও ; উদাহরণযোগ্য দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। যেমন, নীল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে হরিশ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা। তাই যখন এই পর্বের বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম লেখেন, 'শ্রেণীসচেতন কৃষকরা অন্য শ্রেণীর সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে উচ্চশ্রেণী বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এমন কোনো তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নি' (পৃ ১২), তখন তিনি উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেন 'অবশেষে কৃষকশ্রেণী অতিষ্ঠ হয়ে আবু তোরাব চৌধুরী নামক স্থানীয় এক উৎখাত হয়ে যাওয়া জমিদারের নেতৃত্বে ১৭৬৪ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে' (পৃ ৪), বা 'তাই দেখা যায় যে, এ পর্বের বিদ্রোহে নেতৃত্ব আসে মধ্যস্বত্বভোগী থেকে' (পৃ ১০)। কিন্তু আমরা এখানে এমন কোনো আলোচনা পেলাম না যার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি, উৎখাত হয়ে যাওয়ার পর ওই জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগীদের সামাজিক অবস্থানের স্তর তখন কোথায়, অথবা ওই ধরনের জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্বে কোথায় কেমন। বস্তুবাদী চিন্তায় ওই সময়সীমায় সংগ্রামে-শামিল কৃষকদের বা সাধারণ মানুষদের শ্রেণীচেতনার স্তর নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্কের অবতারণা না করেও আমরা স্পষ্ট বলতে পারি, সিরাজুল ইসলামের ওইজাতীয় চিন্তার ভিত্তি কতটা সঠিক তা ভেবে দেখবার অবকাশ আছে। কারণ, আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত, প্রাক্ধনতান্ত্রিক সমাজে যে-কোনো ব্যাপক আন্দোলনই, তা প্রাথমিক পর্বে স্থানীয় দাবির ভিত্তিতে সংগঠিত হলেও, শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার প্রশ্ন, শত্রুমিত্র চিহ্নিতকরণের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নও এসে পড়ে। তাই দেখা যায়, কোনো আন্দোলন বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ নিয়ে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত সম্প্রদায়নির্বিশেষে নিম্নবর্গের মানুষই বেশির ভাগ তার সাথে জড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনা কমবেশি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটেছে। এবং কৃষক আন্দোলনের রাজনৈতিক মর্মবস্তু নিহিত থাকে সেখানেই।

পরবর্তী স্তরের আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম টংক বিদ্রোহ। সময়ের ব্যবধান একটু বেশি। তাহলেও এখানে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরতে চাই—'তাঁদের সাথে আমার আলাপ-আলোচনা থেকে জানতে পারি যে, টংকের অত্যাচারে কৃষকরা জর্জরিত। তাঁরা অবিলম্বে ঐ প্রথার অবসান চান' (পৃ ৩৫০)। এবং পরবর্তী পর্যায়ে দেখলাম টংক আন্দোলনের অন্যতম নেতা মণি সিংহ। এখানে যদি আমরা ধরে নিই, মণি সিংহ ছাড়া টংক আন্দোলন হত না, বা সংগ্রাম অতটা উচ্চ পর্যায়ে উঠত না—তাহলে সিদ্ধান্তটা কতটা সঠিক হবে? তাই বিষয়টির আরো গভীর পর্যবেক্ষণের অবকাশ রয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিস্তৃত আন্দোলনগুলিতে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে কমিউনিসট পার্টি, বিশেষ করে সাংগঠনিক এবং নেতৃত্বের ভূমিকায়—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ছাড়া। যদিও আন্দোলনের সূচনাপর্বে রয়েছে কৃষকদের স্থানীয় দাবিসমূহ, তবু বিদ্রোহের পর্বে তাঁদের শ্রেণীচেতনার যে স্তর এখানে উল্লিখিত—তা সত্যই অতুলনীয়। তা সত্ত্বেও কেন সেই উত্তাল সময়ে উপমহাদেশ জুড়ে অসংখ্য আন্দোলনগুলিকে সমন্বিত করে উত্তরণের নতুন পথে নিয়ে যাওয়া গেল না? শুধু কি 'হঠকারী রণদিভে তত্ত্বের জন্য'?—যা এখানে বলা হয়েছে। নাকি আরো, আরো অনেক কিছু?—যা এইরকম সরল ব্যাখ্যায় উন্মোচিত হবার নয়।

এখানে আরো কিছু এজাতীয় ব্যাখ্যা আমরা পেয়ে যাই; তা কতটা সঠিক আমাদের ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। যেমন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে 'অবাধ ধর্ষণের মাধ্যমে বাঙালার নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তন করে দেয়া' (পৃ ৪২৯)। বা ফরায়েযী ও ওয়াহাবী আন্দোলন প্রসঙ্গে···'পৌত্তলিকতাপ্রবণ ও দেবদেবীর অর্চনা-ভাবাপন্ন চিন্তাধারার বহুল প্রচলন করে নব্য বাংলার কাব্যচর্চা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে নতুন আধুনিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে তাই কালক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় পূর্ণতা লাভ করে' (পৃ ১২২)।

আমরা অবশ্যই স্মরণে রাখব বিপ্লবীদের ত্যাগ, সাহসিকতা আর স্বদেশপ্রেমকে। তবু পূর্ণেন্দু দস্তিদার যখন লেখেন, 'প্রধান বিপ্লবী নেতারা কখনও ভাবেন নি যে নিজেদের শক্তিবলে চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ কবলমুক্ত করার দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হবে' (পৃ ২৮৩) এবং বিভিন্ন বিপ্লবী 'দলের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ না থাকলেও, অনেকটা চক্র বা গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত' (পৃ ২৮৩) তখন পরিষ্কার হয়ে যায় এ-উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন' কোন্ পথে পরিচালিত হয়েছে। এ ছাড়া, বিপ্লবী দলে যোগদানকারীদের মন্ত্রগুপ্তির প্রথা-প্রকরণ এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে এ-উপমহাদেশের একটি বড়ো গোষ্ঠীই এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ছড়ানো-ছিটনো উদ্দীপনাময় অনেক ঘটনা ঘটলেও এর পূর্ণ বিকশিত সাফল্যময় স্তরটি আমরা খুঁজে পাই না।

এ-উপমহাদেশের ইতিহাসের একটি স্পষ্ট ধারাকে গুরুত্বসহকারে তুলে ধরবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্পাদকদ্বয় আর প্রকাশককে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শের নিরিখে সমাজপরিবর্তনে আগ্রহী কর্মীদের কাছে এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চায় নিয়োজিত মানুষদের কাছেও বইটি সমানভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

কমলেন্দু ধর

রুশ-ভারত মৈত্রী

Tagore, India and Soviet Union : A Dream Fulfilled. By A. P. Gnatyuk Danilchuk. Firma K. L. M (P) Ltd., Calcutta-12. Rs. 300.00.

বহুযুগ ধরে রুশদের কাছে ভারত ছিল এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান, এক অগ্রসর সভ্যতার প্রতীক। ১৪৬১-১৪৭২ সালে তিন সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে এলেন আফানাসি নিকিতিন। দেশে ফিরে তাঁর ভারতভ্রমণের সুসংবদ্ধ কাহিনী রুশদের কাছে তুলে ধরলেন। তারপর এলেন লেবেদেফ। কলকাতাবাসীর সঙ্গে তিনি বাঙলায় নাটক মঞ্চস্থ করলেন—পরে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে দেশে ফিরলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কোনোদিনই চায় নি রুশদেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক গড়ে উঠুক—তারা ভারতীয়দের কাছে রুশদের "বিরাট ভল্লুক" বলে পরিচয় দিত। ১৬শ শতকে ভারতের সঙ্গে রুশদেশের প্রথম রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৭০০-১৭০২ শতকে পিটার দি গ্রেটের ডিক্রীর মাধ্যমে প্রথম প্রাচ্যভাষাচর্চার সূচনা। আস্তে-আস্তে রুশ শিক্ষাজীবী গবেষকদের মন আরো বেশিভাবে ভারতের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল, এবং ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, ভাষা—নানা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা নানাভাবে প্রকাশ পেল।

অকটোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত সমাজে ভারত বিষয়ে গবেষণার জন্য এক বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হয়। এই ধারার উপরই মুখ্যত নজর রেখে অধ্যাপক দানিলচুক তাঁর গ্রন্থের মূল বক্তব্যে আসার পূর্বে দুটি অধ্যায় রচনা করেছেন। ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক এবং রবীন্দ্রচর্চা মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলেও তাঁর গ্রন্থের প্রথম দুটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রুশ-ভারত সুসম্পর্কের সোপান কেমন করে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়ে উঠেছে। লেখকের বক্তব্য, রুশদের কাছে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ এসে পৌছাতে পারেন নি। ভারতের সঙ্গে রুশদের যে নিবিড় কালজয়ী সম্পর্ক যুগ-যুগ ধরে দানা বেঁধে উঠেছিল, এ তারই প্রতিফলন। ১৯৪৫ সনে রুশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় "অতেচিয়েসংভিয়েম্মিয়ে জাপিস্‌কি"। তাতে রামমোহন রায় সম্পর্কে প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। ১৮S৭ সালে প্রকাশিত "বিরলিওতেকা ক্লিয়া চিৎয়েনিয়া", গ্রন্থাগারের পড়া দ্বারকানাথ ঠাকুরের উপর প্রবন্ধ, যার মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল কিভাবে দ্বারকানাথ ঠাকুর সামাজিক পরিবর্তনের উপর আঘাত হেনেছেন। পরবর্তী কালে ভারতবিদ বৌদ্ধধর্মবিশারদ মিনায়েভ-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি ১৮৭৪-১৮৮৬ সালের মধ্যে ভারতে আসা-যাওয়া করেন। সেই সময় বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের উপরও তাঁর অনুরাগ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তিনি নিজের হাতে সই-করা "কপালকুণ্ডলা" মিনায়েভকে উপহার দেন। সেটি আজও লেনিনগ্রাদ গ্রন্থাগারে আছে। পরের অধ্যায়ে লেখক রুশ-ভারত সম্পর্কের গঠনমূলক পর্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন। আলোচনার মুখ্য বিষয় তলস্তয় আর ভারতবর্ষ, তলস্তয়ের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা—তাঁর রামকৃষ্ণ পরমহংস আর বিবেকানন্দ সম্পর্কে আগ্রহ আর কৌতূহল। তলস্তয়ের দিনলিপি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন লেখক। ৪ঠা জুলাই ১৯০৮ সনের দিনলিপিতে তলস্তয় লিখেছেন, 'বিবেকানন্দের "ঈশ্বর" সম্পর্কে প্রবন্ধটা পড়ুন—সত্যিই অপূর্ব। একে অনুবাদ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি নিজেই ভাবছিলাম এটা করব। তাঁর শোপেনহাওয়ারের ইচ্ছাশক্তির উপর সমালোচনা সত্য।' হয়তো সেই সময় তলস্তয়ের ধর্মচিন্তার মাধ্যমে রুশদেশ আর-একভাবে ভারতের কাছাকাছি আসতে পেরেছে।

রুশদেশে বাঙলা ভাষা, সাহিত্য, আধ্যাত্মিক চর্চার সঙ্গে-সঙ্গেই রবীন্দ্রচর্চা শুরু হয়েছে। যে-কোনো বিদেশী সাহিত্যের প্রথম পরিচিতির পদক্ষেপ অনুবাদের মাধ্যমে। রুশদেশে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিরেক হয় নি। লেখকের মতে, সারা পশ্চিমী দুনিয়ায় রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প প্রথম অনূদিত হয় রুশদেশে। গল্পের নাম "বিচারক", অনুবাদক শক্লোভস্কি, সন ১৯১৩, মসকো। কোথা থেকে তিনি এটা পেয়েছিলেন তার কোনো সঠিক খবর জানা নেই। তারপর "গীতাঞ্জলি" দু-বার বিভিন্ন অনুবাদকের দ্বারা অনূদিত হয়। এ ছাড়া ১৯১৩ থেকে ১৯১৫-র মধ্যে কবিতা, নাটক, গীতিনাট্য অনূদিত হয়েছে—এইসব অনুবাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ১৯১৫ সালে প্রকাশিত তেরোটি ছোটোগল্পের সংকলন, "বাঙালির জীবন থেকে" অনুবাদক স্লাদ্‌স্কি। এই ছোটোগল্পের সংকলন রুশ পাঠকের কাছে কবিগুরুকে কবি, প্রবন্ধকার, দার্শনিক ছাড়াও ছোটোগল্পলেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই সময়ে জারের রাশিয়াতে রুশভাষা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ লেটিশ, লিথুনীয়, আরমেনীয়, জরজীয় এবং উজবেক ভাষাতেও পাওয়া যায়। ক্রমে একদিকে অনুবাদ আর অপরদিকে সমালোচনা, রবীন্দ্রবিষয়ক ছোটো প্রবন্ধ আর গবেষণার কাজ তুলে ধরেন লুনাচারস্‌কি, তারদভ, ভেনগেরোভা এবং আরো অনেকে। ভারতে সমকালীন রবীন্দ্রভক্তরা এই গবেষণা সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলে মনে হয় না।

পরবর্তী কাল অকটোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত সমাজে রবীন্দ্রনাথ। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সমাজে আকাদেমী অব সায়েনসের অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্য ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ভারতচর্চার এক সুসংবদ্ধ কর্মসূচী নেওয়া হয়। ভারতবিদ তুবিইয়ানস্কি (১৮৯৩-১৯৪৩) বাঙলা ভাষা পড়াতে আরম্ভ করেন। প্রথম বাঙালি যিনি বাঙলা ভাষা পড়ান তিনি নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তবে বেশি দিনের জন্য নয়। যে বাঙালি শিক্ষক বহুদিন ধরে বাঙলা পড়ান এবং অধ্যাপক দানিলচুক যাঁর কাছে বহুদিন বাঙলা ভাষা শিক্ষা করেন তিনি হলেন ভারতীয় বিপ্লবী প্রমথনাথ দত্ত। ছদ্মনাম দাউদ আলী দত্ত হিসাবে ছাত্রছাত্রী নোভিকোভা, বিকোভা দানিলচুকের কাছে তিনি পরিচিত। তিনি কমিউনিসট পাটির সংবাদপত্র "লাঙল" ও "গণবাণী"র মাধ্যমেই তাঁর ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বাঙলা সংবাদপত্রের সঙ্গে পরিচিত করান। কবিগুরুর রচনার অনুবাদ আরো ব্যাপকভাবে হতে থাকে যাতে সারা সোভিয়েতভূমি তাঁকে জানতে পারে। অনুবাদ হয় বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের ভাষায়। কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী পালন, তাঁর সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের পঞ্চাশ বছর পূর্তির উৎসব এবং এই বছরে তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন—বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর বই প্রকাশ, তাঁর সম্পর্কে বহু গবেষণা হয়েছে। লেনিনগ্রাদে এলেনা ব্রসালিনার "রবীন্দ্রনাট্যচিন্তা", রিগায় ইভবুলিশের "রবীন্দ্রসাহিত্যচিন্তা", ছোটোবড়ো প্রবন্ধ আর গবেষণার মাধ্যমে "তাগর" তাঁদের ঘরের কবি।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ কিভাবে রুশদেশকে খুঁজে পেলেন। শুধু রুশ বললে ভুল বলা হবে, সোভিয়েত সমাজে কী কর্মযজ্ঞ চলেছে, তা নিজের চোখে দেখে গেলেন। এই অধ্যায় সম্বন্ধে কিছু সমালোচনা হতে পারে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রুশদেশের পরিচিতি নানা অনুবাদের মাধ্যমে। লেখকের মতে, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের "ভারতী" পত্রিকার প্রবন্ধ—যেখানে লোমোনোসভ, জুকোভস্কি, পুশকিন আর তুরগেনেভের সম্পর্কে রচনা বাঙালি পাঠকমহলে সাড়া জাগায়। ব্রিটিশ শাসনের কড়া প্রহরার শিকল ভেঙে তিনি এগিয়ে আসতে সক্ষম হন নি—কিন্তু তার মধ্যেই নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের রচনা তাঁকে রুশসাহিত্যচিন্তায় উদবুদ্ধ করেছিল—বিশেষত তুরগেনেভের রচনা। এখানে লেখক একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন : "What had Tagore read of Russian classics ? How did he appraise them ? What influence, if any, did these have on him ? These questions have not been much looked into by any research scholar either in the U. S. S. R. or in India. Besides, the material available are too scanty and too scattered." (p 194)। অধ্যাপক দানিলচুকও প্রশ্নটা তুলেছেন, কিন্তু এই কারণের উপর ভিত্তি করে তেমন বিশেষ কিছু আলোকপাত করতে সক্ষম হন নি।

কবিগুরুর রুশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কিন্তু ভারতের মাটিতে নয়, ইংল্যানডে। ১৯২০ সনে তিনি নিকোলাই রোরিখের সংস্পর্শে আসেন, এবং ইংল্যানডে কয়েকবার মিলিত হন। পরেও দুজনের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদানে সুসম্পর্ক অব্যাহত থাকে। বস্তুত সেই সময়ে ভারতবর্ষে রুশচর্চার পরিবেশ ছিল, সীমিত। বুদ্ধিজীবীরা রুশদেশ সম্পর্কে তেমন অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেন নি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ "বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য দেশের সহযোগিতা লাভ করলেও সে তুলনায় সোভিয়েত দেশের সঙ্গে সম্পর্ক সামান্য পত্রালাপেই সীমিত ছিল। তবুও ১৯২৫ সালে সোভিয়েত আকাদেমি অব সায়েনসের তরফ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি টেলিগ্রামে আমন্ত্রণপ্রাপ্তির সংবাদ দিয়ে শারীরিক অসুস্থতার কারণে যেতে পারেন নি। এখানেও সংশয়—শুধুমাত্র শারীরিক অসুস্থতা ? নাকি অন্য কোনো প্রচ্ছন্ন বাধা ? সোভিয়েত দেশে

তিনি গেলেন বৃদ্ধ বয়সে। দেরি করে গেলেও "রাশিয়ার চিঠি" প্রমাণ করে যে নতুন সমাজব্যবস্থা তাঁকে প্রভূত বিস্মিত করেছিল। কিন্তু ফিরে এসে তাঁর পক্ষে রুশ গবেষণা-বিভাগ অথবা রুশভাষাচর্চা 'বিশ্বভারতী'তে খোলবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তাতে প্রধান বাধা। তবে আশ্চর্য লাগে, পরেও বহু কাল 'বিশ্বভারতী' কখনও ভাবে নি, জরমান, ইতালীয়, চীনা, জাপানি ভাষার সঙ্গে রুশ ভাষা-সাহিত্যের চর্চা রাখার প্রয়োজন। আজ সারা সোভিয়েত দেশে যখন চলেছে বিরাট রবীন্দ্রচর্চা, সে তুলনায় মাত্র গত ন বছরে 'বিশ্বভারতী'তে রুশভাষাচর্চার বিভাগ খোলা হয়েছে।

বইটি মুখ্যত তথ্যপ্রধান। লেখক বহু তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করেছেন। রুশ-ভারতের যে বহু যুগের সুদূর আত্মিক বন্ধন—ভাষা সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতায় শিল্পে যে একে অপরের কত নিকট, লেখকের প্রথম চেষ্টা তার বিবরণ দেওয়া। কিন্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে নয়, তথ্যসংযোজন ও উদ্ধৃতির সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি রুশ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তথ্যের মাধ্যমে। রাশিয়া কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পেল, এবং রবীন্দ্রনাথ কিভাবে রাশিয়াকে খুঁজে পেলেন, তার এক কালবাহী ইতিহাসও নানা তথ্য, পত্রাবলীর মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন। বিশ্লেষণের বড়োই অভাব। অনেক সময়ে কেবল তথ্যের সাহায্যে পাঠকের মন জয় করা যায় না। এখানে কিন্তু সুচিন্তিত ধারাবাহিকতায় তথ্য পরিবেশিত হয়েছে বলে লেখকের পরিকল্পনা সব দিক থেকে সাফল্য অর্জন করেছে। একদিকে বিদেশী পাঠকের কাছে যেমন বহু রুশ ও সোভিয়েত তথ্য মূল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছে, অপর দিকে মসকোতে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন কর্মসূচী আর পত্রালাপ সোভিয়েত পাঠকের কাছে খুবই মনোজ্ঞ আর মূল্যবান।

বইটির আর-একটি একঘেয়েমি প্রচুর টীকার অবতারণা। এইরকম গবেষণামূলক তথ্যভিত্তিক রচনায় টীকার সত্যিই প্রয়োজন হয়, কারণ সবই মৌলিক। কিন্তু বক্তব্যের প্রতি ছত্রে যদি এত টীকার উল্লেখ থাকে তাতে পাঠে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এত টীকার অবতারণা না করে লেখক যদি কিছু-কিছু আলোচনার সঙ্গে সেগুলিকে স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে দিতে পারতেন তাহলে লেখার গতিরোধ হত না এবং পাঠকও সহজ সাবলীলতায় পড়তে পারতেন। যে-কোনো মৌলিক রচনায় টীকার সংখ্যা বাড়ে কিন্তু এখানে টীকার উপরই প্রধান গুরুত্ব এনে ফেলেছেন।

শেষে বলা যায়, রুশ ভাষায় লেখকের বক্তব্য যত সুন্দরভাবে বিকশিত হয়েছে (রুশ ভাষায় বইটি আমি পড়েছি) সে তুলনায় ইংরেজি অনুবাদ যেন মূল রুশের শব্দগুলিকে সাজিয়ে ছাপিয়ে দিয়েছে—ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশ পায় নি। অনুবাদের মান আরো ভালো হলে ভালো লাগত।

পূরবী রায়

বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা

প্রসঙ্গ—সংকলন ২, ভাদ্র ১৩৯৩।
সাহিত্যপত্র—৩য় বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপটেমবর, ১৯৮৬ ও অকটোবর-ডিসেমবর ১৯৮৬।
পাণ্ডুলিপি—দশম খণ্ড, ১৩৯৩।
মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা—প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অকটোবর-ডিসেমবর ১৯৮৫।
সুন্দরম—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগসট-অকটোবর '৮৬।
অংগীকার—ঈদ সংখ্যা, ১৯৮৫।

ভাষা-সংস্কৃতি-শিল্পচেতনামূল্যবোধের অন্তহীন মিল সত্ত্বেও দুদেশের সীমানায় কাঁটাতার। অবধারিত সত্য মেনে নিলেও একটি আকাঙ্ক্ষা নিয়ত কাজ করে মনের ভিতরে—তা হল, যদি দু বাঙলার পত্রপত্রিকাগুলির অবাধ গতায়াত অন্তত থাকত। তবু এখন এই বাঙলায় কিছু পত্রপত্রিকা আসছে ওপার-বাঙলা থেকে—এ অবশ্যই স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ছোটো পত্রিকা হাতে নিয়ে যে যত্ন-শ্রম-ভালোবাসা লক্ষ করা গেল, তা সত্যি আনন্দের। এই পত্রিকাগুলির একটি সাধারণ চরিত্র—এরা খুব বেশি দিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে না। অথচ এই স্বল্প সময়ের মধ্যে পত্রিকাগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সম্পাদকীয় থেকে বোঝা যায়—এদের নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী আছে যারা অবশ্যই চটুল সাহিত্যরসের অভিমুখী নয়।

শিল্প ও সমাজভাবনার পত্রিকা "প্রসঙ্গ"-র এটি দ্বিতীয় সংকলন। প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল বছর খানেক আগে। সম্পাদনাপরিষদে রয়েছেন আবুল মনসুর, ফয়েজুল আজিম, আজিজ শরাফী, ঢালী আল মামুন আর শাহাদুজ্জামান। এঁরা নিয়মিত বিরতিতে পত্রিকা প্রকাশের চেয়ে মননশীল উপযুক্ত লেখার অনুসন্ধানী। এঁদের মনে হয়েছে, সাধ্যাতীত মুদ্রণব্যয়, কাগজের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ যথেষ্ট উদ্যমে এবং পরিশ্রমে সম্ভব, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ লেখা সংগ্রহ করার প্রতিকূলতা অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। দায়সারা ফরমায়েশি লেখার জনজালে ভরতি এই বাঙলার ছোটো পত্রিকাগুলির করুণ অবস্থার পটভূমিতে এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য—যখনই যথেষ্ট ভালো লেখা পাওয়া যাবে তখনই পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাই নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে পত্রিকাপ্রকাশে এঁরা আগ্রহী নন বলে এই সংকলনটিতে পেয়ে যাই "নাট্যকার ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রসঙ্গে" শামইম সুলতানের উল্লেখযোগ্য আলোচনা। মানুষের সৃষ্টিকর্ম চিন্তাভাবনা সব-কিছুই সামাজিক-বাস্তব কর্মজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, নাকি, বস্তুনিরপেক্ষ চেতনাপ্রক্রিয়া, অথবা কি ডিভাইন ম্যাডনেস ইত্যাদি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন লেখক এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষপাত মার্কসবাদী সাহিত্যের ধারাটির প্রতি। যদিও সুররিয়ালিজম, অ্যাবসার্ডিটি, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি আন্দোলনও তাঁর আলোচনার বাইরে নয়। সবশেষে তিনি বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের স্বরূপসন্ধানেও নিজের অভিনিবেশ-ঋদ্ধ বক্তব্য জানিয়েছেন। দীর্ঘ ষাট পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধটি কিছুটা পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে অনেকেই উপকৃত হবেন। এর পরের রচনাটি গর্ডন ক্রেগের মূল লেখার ভাষান্তর। করেছেন আলম খোরশেদ। নাটকের শিল্প কোন্‌টি—এই নিয়ে লেখাটির কথোপকথন শুরু। আনুষঙ্গিক অজস্র প্রশ্ন এসেছে এবং এর প্রশ্নকর্তা দর্শক আর উত্তরদাতা নির্দেশক। জামিল আহমেদ লিখেছেন "নাটকে সেট ডিজাইন নিয়ে একটি আলোচনা"। মূলত "প্রসঙ্গ" পত্রিকার এই সংখ্যার মূল বিষয় নাটক। তবে সেরগেই আইজেনস্টাইন-এর অসম্পূর্ণ একটি চিত্রনাট্যের অনুবাদও রয়েছে। কিন্তু এই সংখ্যার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ বাংলাদেশের সর্বাগ্রগণ্য গল্পকার হাসান আজিজুল হকের সঙ্গে একটি সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার। হাসান আজিজুল হক কয়েকটি উপন্যাস লিখলেও তাঁর মূলক্ষেত্র ছোটোগল্প, এবং আজ পর্যন্ত মাত্র ছটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই ছোটোগল্পগুলি বাঙলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে—কলকাতা থেকে প্রকাশিত "নির্বাচিত গল্পে" এঁর অনেক বিখ্যাত গল্প অন্তর্ভুক্ত। এই "নির্বাচিত গল্পে"র নির্বাচক এপার-বাঙলার বিখ্যাত গল্পকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। এই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শাহাদুজ্জামান সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন। মেধা- ও মনীষাদীপ্ত বিতর্কিত প্রশ্নের সুন্দর স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন প্রখ্যাত গল্পকার। 'মার্কসীয় সাহিত্য' ধারণাটির স্বরূপ আপনার কাছে কেমন?—এই প্রশ্নের পুরো উত্তরটাই এখানে দেওয়া যাক: এ প্রশ্নের সহজ মীমাংসা নেই। দর্শনে 'ক্যাটিগরি মিসটেক' বলে একটা কথা আছে। যেমন কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কোন্‌টি? আমি তাকে অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ বিলডিংটা দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ বিলডিংটাই তো আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নয়, আর্টস বিলডিংও নয়। সবটা মিলিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়। তাহলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বলে আসলে সেই অর্থে কিছু নেই। অনেকগুলো জিনিস একত্র করে তার একটা নাম দেয়া হয়। মার্কসীয় সাহিত্যও অনেকটা ওরকমই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যেন। তার চেয়ে বলা ভালো, আমরা যখন এই বাস্তব সমাজের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব আর সম্পর্কগুলোর আলোকে আমাদের জীবনকে দেখবার চেষ্টা করি, এবং সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণকে যখন সাহিত্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করি, তখন সেই সাহিত্য একদিক থেকে মার্কসীয় সাহিত্য হয়ে ওঠে। অবশ্য এতে সমস্যা আছে অনেক। কারণ মার্কসীয় দর্শনের নন্দনতত্ত্বের ব্যাপারটি খুবই জটিল। লেনিনকে যেভাবে মার্কসীয় রাজনীতি বা বৈপ্লবিক রাজনীতি করতে হয়েছে তাতে তিনি সাহিত্য-বা শিল্পবিচারের যথেষ্ট সময় পান নি। পরবর্তী কালে এ ব্যাপারে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁরা lesser talent। ফলে, আমি মনে করি, এখনও মার্কসীয়

সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা রয়ে গেছে। আমাদের দেশে এখনও মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের উপর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো লেখা আমার চোখে পড়ে না। তবে যদি মোটাদাগে মার্কসীয় সাহিত্যের লক্ষণ কী জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলতে পারি যে, 'মার্কসীয় সাহিত্যে, মানুষের জীবনকে তার সত্যস্বরূপে হাজির করবার চেষ্টা থাকে।' আরো উল্লেখযোগ্য অনেক কথোপকথন রয়েছে যা যে-কোনো পাঠকের চিন্তাকে উশকে দেবে—বিপ্রতীপ চেতনারও জন্ম দেবে। হাসান আজিজুল হকের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দ। এ ছাড়াও যাঁদের কবিতা ভালো লাগে তাঁরা হলেন শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ, আবুল হাসান, মোহাম্মদ রফিক, রফিক আজাদ, মহাদেব সাহা। এপার বাঙলার শক্তিসুনীলশঙ্খ তাঁর প্রিয় কবি। প্রিয় লেখকদের তালিকায় রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করও খানিকটা। তবে শরৎচন্দ্র এখন ওঁর কাছে 'একদম ফিকে হয়ে এসেছে।' এপার-বাঙলার সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসটিকে তাঁর উল্লেখযোগ্য মনে হয়। কমলকুমার মজুমদারকে তাঁর অসাধারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে হয়েছে এবং 'ক্ষমতার দিক থেকে তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে তুলনা করা যায়' বলে মনে করেন। বিতর্কিত লেখক সুবিমল মিশ্রকেও তাঁর শক্তিমান প্রতিভা বলে মনে হয়েছে।…এই সাক্ষাৎকারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং আন্তরিক উচ্চারণে উষ্ণ বলে খুবই আকর্ষণীয়। "প্রসঙ্গ"-র এই সংকলনটি সংগৃহীত হবার যোগ্য।

"সাহিত্যপত্রে" প্রবন্ধ গল্প কবিতা আলোকপাত স্মৃতিকথা ভ্রমণ চলচ্চিত্র এবং গ্রন্থপ্রসঙ্গ ও সমালোচনার এক সার্বিক আয়োজন। এই পত্রিকার ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যার "জীবনানন্দ দাশের আধুনিকতা" প্রবন্ধটি বেশ কিছু বিতর্কের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রবন্ধকার আবু জোবের প্রশ্ন তুলেছেন: 'প্রগতির প্রশ্নে যেখানে আবিষ্টকরা অতীতমুখীনতা অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং মানুষকে যুক্তিচালিত হতে না দিয়ে বরং বিশ্বাস ও সংস্কারপ্রবণতাকে লালন করে সেখানে তাহলে জীবনানন্দের এই দৃষ্টিভঙ্গি কি প্রগতির পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে?' এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: 'রূপসী বাংলা' কবিতাগ্রন্থে জীবনানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানের প্রগতিশীল 'আধুনিক' নয়, কিন্তু স্বদেশকে চিনবার ও ব্যাকুলভাবে তাকে হৃদয়ে ধারণ করবার যে অকপট প্রয়াস তার মূল্য নিঃসন্দেহে অনেক বড়ো'। দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত ছটি গল্পের মধ্যে ভালো লাগলো নয়ন রহমান, হরিপদ দত্ত ও শাহাদুজ্জামান-এর লেখা। বারোটি কবিতার অধিকাংশই সমাজমনস্ক অনুভূতি থেকে জন্ম নেয়া। আঙ্গিক নিয়ে চর্চার চেয়ে এঁরা সহজসরল শব্দের বিন্যাসে সোজাসুজি কথা বলার পক্ষপাতী। হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন: 'আর আমার চোখের সামনেই রক্তের দাগ-লাগা সবুজ রঙের / বাংলাদেশ দিন দিন হয়ে উঠলো বাঙলাস্তান।' জুলফিকার মতিন-ও খুবই রাগী উচ্চারণে লেখেন: 'আমি হত্যাকাণ্ড দেখেছি / আমি ভ্রূণনাশ দেখেছি / আমি ধর্ষণ দেখেছি / কিভাবে লোভের মধ্যে মানুষ নিজেকে বিকিয়ে দেয় / জন্মজন্মান্তরের শৃঙ্খলা কি করে আপন সন্তানের জন্য তুলে রাখে / একজন প্রগতিশীল কিভাবে নিশেষিত হয়ে যায় / পচা ডিমের মত পূতি দুর্গন্ধময় / আমি তাও দেখেছি / আমি তাই আপনাদের সবার মুখে কালি মেখে দিতে চাই।' নাসির আহমেদ-এর প্রেমের কবিতা 'এ কেমন নিষ্ঠুরতা' চমৎকার লাগল হৃদয়ের অমল রক্তপাতে। কিন্তু ভাষায় আর আঙ্গিকে কেমন যেন প্রাচীনতার ছোঁয়া।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য সমিতির মুখপত্র "পাণ্ডুলিপি"র দশম সংকলনে ১১৯ পাতার দীর্ঘ "একালে নজরুল" শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক আহমদ শরীফ। এই প্রবন্ধকারের নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি অনেক অমোঘ সত্য প্রকাশে নির্মম। তাই তিনি নজরুলসাহিত্যের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন ভালোবাসায় এবং চূড়ান্ত সমালোচনায়। নজরুলের দাম্ভিকতা যে অশালীন ঔদ্ধত্য, তাও বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। তিনি লিখেছেন: 'রচনা'র গুণগত বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও স্বদেশে নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতার ও গানের জন্য রবীন্দ্রনাথের মতোই জনপ্রিয়। বাঙলা দেশে গর্বিত স্বধর্মীর মুখে প্রায় 'রবীন্দ্র-নজরুল' একসঙ্গেই হন উচ্চারিত' আবার অন্যত্র লিখেছেন: 'কিন্তু নজরুলের গানের অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে দ্বি-মতের অবকাশ রয়ে গেছে। গানের আঙ্গিক পূর্ণতা কিংবা ভাবের গভীরতা অথবা বক্তব্যের ও সুরতাললয়ের বিশুদ্ধতাও গানকে কালজয়ী করে না। পরিত্যক্তও হয় না ত্রুটির জন্যে। গায়ত্রী মন্ত্রের কাল থেকে আজ অবধি কোনো কালের গান পৃথিবীর কোথাও কালান্তরে টিকে থাকে না। রবীন্দ্রনাথের গানও কবিতা হিসেবে পাঠযোগ্য থাকলেও কিছুকাল পরে সঙ্গীত হিসেবে লোকপ্রিয় থাকবে না।' অনেক ক্ষেত্রে সহমত না হলেও মুক্তমনের এই মননশীল প্রাবন্ধিককে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। এ ছাড়াও সংখ্যাটিতে প্রবন্ধ লিখেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্র এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনীতিভূষণ কানুনগো, ভুঁইয়া ইকবাল ও দিলওয়ার হোসেন। দিলওয়ার হোসেন পত্রিকাটির সম্পাদকও। তিনি যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তা অজস্র-তথ্যপঞ্জীনির্ভর কিন্তু মূল্যবান। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'মুঘল ইতিহাসে ব্যবহৃত বাংলা উপন্যাস রচনার পটভূমি'। এ বিষয়ে যে-কোনো গবেষকের কাছে এটি পথনির্দেশিকা।

পত্রিকা-সম্পাদকের নামে একটিও পত্রিকা আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সেদিক থেকে 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা' নতুনত্বের চমক দিল। এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান সম্পর্কিত বিশেষ ক্রোড়পত্রটি। শিল্পীর আঁকা বেশ কিছু স্কেচ রয়েছে এবং দুটি প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে 'তিন কন্যা' ও শিল্পিকৃত আত্মপ্রতিকৃতি। এই শিল্পীর জীবনে রয়েছে এক গভীর ট্র্যাজেডি—তাই তাঁর রেখার বক্রতায় প্রকাশিত হয়ে উঠেছে তিক্ততা আর হতাশা। তাঁর কাছে নষ্ট মানুষ, নষ্ট রমণী এবং মানুষের বিভিন্ন সম্পর্ক নষ্ট। 'তখন পুরুষের মুখ পরিণত হয় পশুতে, রমণীর ডোলে দেখা দেয় ছোবল; কিংবা পুরুষ পরিণত হয় শেয়ালে, কুমিরে; রমণী পর্যবসিত হয় ডাইনীতে। কিন্তু এই পর্যবসিতকরণের প্রক্রিয়া আবার রূপকথার পথ ধরেই। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিক সমস্যা হিসেবে থেকে যায়।'—এই বিশ্লেষণ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এর। খালেদ চৌধুরী লিখেছেন 'কামরুল প্রসঙ্গে' একটি আলোচনা সেখানে তিনি কিন্তু বলেছেন: 'বাঙলার জলমাটি, গাছপালা, পশুপাখি থেকে শুরু করে মানবজীবনের সার্বিক রূপ তাঁর ছবিতে অতি বিশ্বস্ততায় প্রতিফলিত। শুধু এই কারণেই আবার বলছি কামরুল একান্তভাবেই বাঙালী শিল্পী।' ওয়াহিদুল হকের মতও তাই: 'কখনো ছাড়েন নি তিনি দেশের আত্মাকে।' সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে শামসুর রাহমান আলোচনা করেছেন তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য এবং অজস্রতা নিয়ে। বিপ্লব দাশ একটি কবিতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন শিল্পীর প্রতি যেখানে তিনি লেখেন 'আমাদের শৈশবের যৌবনের শেষ জীবনের / তুলিকলমের যুবরাজ কামরুল হাসান।'…পত্রিকাটিতে ফণীশ্বরনাথ রেণু-র 'ময়লা আঁচল'-এর অনুবাদের এক কিস্তি রয়েছে। মকবুল ফিদা হুসেন-এর চারটি কবিতার অনুবাদও পাওয়া গেল। সম্পাদকের কড়চা চমৎকার।

"সুন্দরম্" পত্রিকার ১ম সংখ্যায় রয়েছে কামরুল হাসানের 'আপন কথা।' সৈয়দ আলী আহসান আলোচনা করেছেন নজরুল ইসলামের কবিতায় শব্দের অনুষঙ্গ নিয়ে। উল্লেখযোগ্য এই রচনাটির মধ্যে 'সিলোজিসটিক প্রোগ্রেশন' পাচ্ছি যার মধ্যে 'ইমোটিভ প্রোগেশনে'র অভাব রয়েছে এবং একটি সুগ্রথিত প্রবন্ধের এই চরিত্রলক্ষণ হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের দুটি বিখ্যাত ছোটোগল্প নিয়ে (নিশীথে ও পোস্টমাস্টার) গল্পের শরীর ও নির্মাণকৌশল প্রসঙ্গে সুন্দর আলোচনা করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। রবীন্দ্রসংগীতের পূর্বধারার সূচনা পর্ব প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোচনা রয়েছে ওয়াহিদুল হকের লেখাটিতে। আতাউর রহমান লিখেছেন "থিয়েটার: পালাবদলের ইতিবৃত্ত।" তিনি বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গেও কিছু কথা বলেছেন, তা কিন্তু আরেকটু বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী ছিল। সুন্দর ছাপা বাঁধাই পত্রিকাটির শরীরে এক স্নিগ্ধ ব্যঞ্জনা এনেছে। এই সংখ্যার প্রচ্ছদ রেখাঙ্কন করেছেন সুখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান। পত্রিকাটি শতায়ু হোক।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রিকা "অংগীকারে"র এটি দ্বিতীয় সংখ্যা। সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত কবি আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ। সম্পাদকীয়তে অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনাকে সাদরে গ্রহণ করবেন বলে এঁরা জানিয়েছেন। কিন্তু এঁরা 'সাহিত্য সংস্কৃতির বন্ধ্যা-বাগান' বলেছেন কেন তা স্পষ্ট হয় নি এই প্রতিবেদকের কাছে। বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় এত উল্লেখযোগ্য লেখা প্রকাশিত দেখে অন্তত ওঁদের সঙ্গে সহমত হওয়া গেল না। ওঁদের ঘোষণামত আমাদেরও ইতিবাচক সাহিত্যের প্রতি পক্ষপাত রয়েছে। 'অপসংস্কৃতির

প্রবল জোয়ারের মধ্যেও বাংলাদেশের ছোট পত্রিকাগুলির বিপরীত টানও কম জোরালো নয় বলেই সিদ্ধান্ত করতে ইচ্ছে হয়।…এই সংখ্যার দুটি বিদগ্ধ প্রবন্ধের লেখক সৈয়দ আলী আহসান এবং আবদুল মান্নান তালিব। শ্রদ্ধেয় কবি ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশের কবিতা-গল্প-উপন্যাসের অবক্ষয়ের মূল সূত্রগুলি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি আন্তরিক ; তাঁর জীবনবীক্ষাও রয়েছে কিন্তু তিনি নির্মোহ নন। তাই তিনি যেসব সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে গেছেন তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নিজস্ব কল্যাণবোধের ভাবনা—তাঁর ধর্মচিন্তা এবং আবহমান মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস ও অঙ্গীকার। কিন্তু শাসিত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কিংবা পূর্বনির্ধারিত নৈতিক সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে সাহিত্য রচিত হলে তা হবে খণ্ডিত—এমনধারা কথাবার্তা বলতে শুনেছি অনেক বিদগ্ধজনকে। আবদুল মান্নান তালিবও সৈয়দ আলী আহসানের কথাগুলির যেন পুনরুচ্চারণ করেছেন অবশ্যই তাঁর নিজস্ব যুক্তিতে। ইনিও নিয়ন্ত্রিত রচনার পক্ষপাতী। এই সংখ্যার দীর্ঘ প্রবন্ধটির লেখক শাহাবুদ্দীন আহমদ। তিনি “রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম” শীর্ষক রচনাটিতে দুই বিশাল প্রতিভার অন্তরঙ্গ দিকগুলি নিয়ে সুখপাঠ্য সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আল মাহমুদ একটি চমৎকার ছোটোগল্প লিখেছেন—নাম ‘গন্ধবণিক’। স্নিগ্ধ কবিতার ভাষায় রচিত গল্পটিকে অনেক সময়ই একটি নিটোল কবিতা বলে মনে হয়েছে। আল মাহমুদ আরো গল্প লিখুন—এই আবেগদীপ্ত আবেদন রইল।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

শ্রাবণ—প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। অকটোবর-ডিসেমবর ১৯৮৬। সম্পাদক : মনসুরে মওলা। ৮/১০ আমিরবক্স ভিউ, নীলক্ষেত, ঢাকা-৫। চল্লিশ টাকা।

দুই বাঙলার সাহিত্যানুরাগী মানুষদের কাছে নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই ‘শ্রাবণ’ পত্রিকার প্রকাশ। সাহিত্য আর সংস্কৃতির বর্ণমুখর প্রান্তরে ছোটোবড়ো বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে কলকাতা আর ঢাকা থেকে। কমারশিয়াল হাউসের পত্রিকাগুলির সততায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ না করেও বলতে পারি, লোকরঞ্জনের সাময়িক নগদ-বিদায়ের প্রলোভনে বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের আপোস করতে হয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংবাদধর্মী চটুল ফীচারকে প্রবন্ধের রাঙতায় মুড়ে জনপ্রিয়তা রক্ষা করতে হয়।

আমাদের সৌভাগ্য, দুই বাঙলায় হাতে-গোনা কিন্তু সৎ পত্রিকা এখনো নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, সাহিত্যের সত্যিকারের গভীর মননশীলতায় যাঁরা আস্থা ফিরিয়ে আনেন। সাহিত্য আর সংস্কৃতির শীলিত অনুশীলনে তাঁরা নিয়ত উৎসাহী। বলা বাহুল্য, ঢাকা থেকে প্রকাশিত নতুন ত্রৈমাসিক “শ্রাবণ” এই গোত্রের পত্রপত্রিকার আসরে নবীনতম সদস্য।

প্রথম সংখ্যার “শ্রাবণ” হাতে নিয়ে প্রথমেই মন ভরে যায়, প্রবন্ধ ও আলোচনাগুলি পাঠ করে। শান্তনু কায়সারের প্রবন্ধ “কবির বিশ্বাস ও তার কবিতা” তথ্য এবং যুক্তির মৌলিকতায় বুদ্ধিজীবী-মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বোধকরি প্লেটোর সময় থেকে এই একুশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজ অবধি কবির অস্তিত্ব, তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পাপ-পুণ্য, দার্শনিকতা আর স্ববিরোধিতা নিয়ে অজস্র বিতর্ক, সমালোচনা আর বিশ্লেষণ হয়েছে। শান্তনু কায়সারের প্রবন্ধে মধুসূদন ও কাজী নজরুলের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস এবং তাঁদের সৃষ্টির সমবেত দ্বন্দ্ব, সংকট আর কূটাভাস প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত হলেও তাঁর প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্যপুরুষ অবশ্যই বহুবিতর্কিত ব্যক্তিত্ব কবি আল মাহমুদ। মার্কসবাদ থেকে ইসলামধর্মে আল মাহমুদের পরিবর্তিত বিশ্বাস অর্জনের পেছনের যুক্তিগ্রাহ্য কারণটিকে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করেছেন শান্তনু কায়সার।

“দৃষ্টিকোণ” বিভাগে অসীম রায়ের মৃত্যুর আগে লেখা একটি প্রবন্ধ “বিজ্ঞানীর জীবনদর্শন” নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের নতুন করে অসীম রায় সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলে। যদিও অম্লান দত্তর একটি প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনাটি নিতান্তই দায়সারা হয়েছে বলে মনে হয়। লোরকার মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর-একটু তথ্যবহুল হলে খুব ভালো লাগত।

“শ্রাবণে”র বই-সমালোচনার বিভাগটি বেশ বিস্তৃত। দেশবিদেশের একগাদা বই আলোচনা করতে গিয়ে অবশ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে স্থান সংকুলানের। ফলে প্রতিটি আলোচনা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত। যদি বইগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই “শ্রাবণে”র একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তাতে এ ধরনের সিরিয়াস পত্রিকার মান লঘু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমার মনে হয়, কয়েকটি বিশেষ বই বেছে নিয়ে যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করলে “শ্রাবণে”র গাম্ভীর্য রক্ষা পাবে।

লোরকার নিজের হাতে আঁকা কিছু রেখাচিত্র ও মূল স্প্যানিশ থেকে তাঁর কবিতার অনুবাদ পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। রফিক আজাদের একগুচ্ছ নতুন কবিতাও কম আকর্ষণীয় নয়। আহমদ আকবরের ছোটগল্প “উড়াল” পাঠকের কাছে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

বস্তুত দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ ও রুচিশীল পরিচ্ছন্নতায় স্নিগ্ধ নতুন পত্রিকা “শ্রাবণে”র কাছে আমাদের প্রত্যাশা দিন-দিন বৃদ্ধি পাবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

কামাল হোসেন

সর্বভারতীয় বাৎসরিক প্রদর্শনী প্রসঙ্গে

শীতের কলকাতা শিল্পসংস্কৃতির মৌসুম। শিল্পক্ষেত্রে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের সর্বভারতীয় বাৎসরিক প্রদর্শনী অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই প্রদর্শনীতে প্রত্যেক বছর দেশের বহু প্রথিতযশা শিল্পীর চিত্রকর্ম এবং ভাস্কর্য উপভোগ করবার সুযোগ ঘটত, কিন্তু বর্তমান কালের পরিবহণ-সমস্যার জন্য তুলনামূলকভাবে বাইরের শিল্পকর্মের সংখ্যা কমে আসছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অ্যাকাডেমীর সৌজন্যেই আমরা নবীন শিল্পীদের শিল্পকর্ম-সব সময় দেখতে পাই। এঁদেরই মধ্যে অনেকেই হয়তো একদিন নামজাদা শিল্পী হয়ে উঠবেন, এই আশা নিয়েই তাঁদের শিল্পকর্মকে গ্যালারির প্রাচীরে যথাযোগ্য স্থান দিয়ে উৎসাহিত করা হয় এবং প্রতিশ্রুতিবান শিল্পীকে পুরস্কৃতও করা হয়। অতীতে এইভাবে স্বীকৃতি-লাভ-করা বহু শিল্পী আজ ভারতের শিল্পজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এ বছর ৯০০ চিত্র এবং ভাস্কর্য ভারতের নানা স্থান থেকে এসেছে—যেমন, উড়িষ্যা, বড়োদা, হায়দ্রাবাদ, রাজকোট, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, বারাণসী, নয়াদিল্লী, লখনউ, পাটনা, ত্রিপুরা আর শান্তিনিকেতন। অ্যাকাডেমীর বিচারকমণ্ডলী এই ৯০০ শিল্পকর্ম থেকে ৩০০-র ওপর চিত্র-ভাস্কর্য নির্বাচিত করে কলারসিকদের জন্য ছয়টি গ্যালারিতে সাজিয়ে রেখেছেন। এগুলির মাধ্যম তেলরঙ, জলরঙ, গোয়াস, প্যাসটেল, এচিং, লিথোগ্রাফ, চারকোল, কালিকলম, কাঠখোদাই এবং মিশ্র মাধ্যম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এখানে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণে আঁকা চিত্রের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্যালারি রাখা হয়েছে। এই ধরনের ব্যবস্থা সর্বভারতীয় অন্য কোনো প্রদর্শনীতে কোনো সময় দেখতে পাওয়া যায় না।

এই প্রদর্শনীতে বাস্তবধর্মী চিত্র থেকে বিমূর্ত এবং বিভিন্ন ধারার কাজও রয়েছে। অবশ্য বিমূর্ত চিত্রের প্রতি ঝোঁক ক্রমশ কমে আসছে।

চিত্রকলা

কোনো-কোনো চিত্রে রহস্যময় মিসটিক এবং অতিবাস্তব ধরনের সৃষ্টির প্রতি শিল্পীর আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু এই ধরনের কাজে সেই কল্পিত রূপকে প্রকাশ করতে গিয়ে কোথায় যেন আটকে গেছে। তার প্রধান কারণ হল, এইজাতীয় চিত্র সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজনীয় দুটি গুণের প্রতি শিল্পীকে সজাগ থাকতে হয়। প্রেরণার দ্বারা শিল্পসৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে শিল্পীর জ্ঞান এবং অঙ্কনদক্ষতাও একান্ত প্রয়োজন। চিত্রপটে এই দুটি গুণের সংমিশ্রণ না হলে এ ধরনের শিল্পকর্মের রূপ ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। বেশ কয়েক বছর আগে এই গ্যালারিতে কলকাতা, মাদ্রাজ আর বোমবাই স্কুলের জলরঙের বহু চিত্র দেখতে পাওয়া যেত। এই মাধ্যমে শিল্পী যখন কাজ করেন তখন রঙিন তুলি দিয়ে ড্রইং করে যান, দুটো বা তিনটে 'ওয়াশ' অর্থাৎ রঙ সংস্থাপন করেই ছবি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এই ভাবের কাজে রঙের স্বচ্ছতা আর উজ্জ্বলতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হতে পারে না। কিন্তু আজকাল এই ধরনের কাজ কম দেখা যায়। অবশ্য এই প্রদর্শনীতে কয়েকটি জলরঙের কাজ আমাদের ভালো লেগেছে। এখানে সাদা রঙ ব্যবহার করা হয় না যদিও 'ইনডিয়ান পেইনটিং'-এ যৎসামান্য সাদা রঙ ব্যবহার করে একটি 'পার্লি' ভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

আজকাল আর-একটি নতুন ধারার প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। তা হল প্রাচীন ভারতীয় পট থেকে বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি ব্যবহার করে আঁকা চিত্র। সময়ে-সময়ে এই ধরনের চিত্র শুধু শিল্পীরা আঁকেন নি, তাকে পুরানো দেখাবার জন্য ঘষামাজাও যে করেছেন, তা দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া, শিল্পীরা আমাদের বহু পুরানো চিত্র, ভাস্কর্য আর পুঁথি থেকে 'মোটিফ' আহরণ করেও চিত্র রচনা করেছেন। এইজাতীয় চিত্রসৃষ্টির ঝোঁক আমাদের শিল্পপরম্পরার দিকে নবীন শিল্পীদের কিছুটা সজাগ করে দিলেও তাতে মৌলিক চিন্তার অবকাশ বেশি থাকে না। যা হোক, বহির্মুখী হয়ে পাশ্চাত্ত্য থেকে অনুপ্রেরণা লাভের চেষ্টা এবং কলাকৌশলের অনুকরণ করার চেয়ে অন্তর্মুখী হয়ে নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি সজাগ থেকে কাজ করাটা বহু গুণে ভালো বলা যায়। বলা বাহুল্য, পৃথিবী আজ ছোটো হয়ে আসছে, এবং বিশ্বের শিল্পকলার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগও দিন-দিন বেড়ে চলেছে বলেই আধুনিক শিল্পী বিশ্বের নানা হাট থেকে বহু কলাকৌশল আহরণ করে আনতে সক্ষম হয়েছেন। প্রত্যেক শিল্পীরই এই কথাটার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে নিজস্ব নিষ্ঠার শক্তিতেই মহৎ শিল্পের সৃষ্টি সম্ভব হয়। যদি কোন নিষ্ঠাবান শিল্পী বিদেশের কলাকৌশলের প্রতি আকৃষ্ট হন তাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু পশ্চিমের রীতিকে শুধু অনুসরণ করে কোনো ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে মহৎ শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যদি কোনো শিল্পী পশ্চিমের শিল্পরীতি বা কলাকৌশল আয়ত্ত করে থাকেন, তাহলে তার সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যসম্মত কলাকৌশল, গুণ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতে হবে। নিষ্ঠাসহ এই সমন্বয়সাধনেই আধুনিক ভারতীয় শিল্পের মর্যাদা এবং মানদণ্ড উঁচু হয়ে উঠবে, কিন্তু অনুকরণে নয়।

বলা বাহুল্য, যাঁরা গড়তে সক্ষম তাঁদেরই ভাঙার অধিকার থাকে। কিছু কিছু আধুনিক কাজে ভাঙাটাই দেখি বড়ো হয়ে উঠছে। গড়ার পাঠশালায় যাঁরা নিষ্ঠাসহকারে জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁরাই শুধু ভাঙবার বা গড়বার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারেন। এই জ্ঞানের অভাব অনেক চিত্রেই অনুভূত হয়। প্রকাশভঙ্গি ও কলাকৌশলের ত্রুটির ফলেও অনেক ভালো পরিকল্পনাও শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না।

ভাস্কর্যের-ক্ষেত্রে নানা ধরনের মাধ্যম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আজকাল প্রদর্শনীতে খুব বড়ো কাজ বিশেষ দেখা যায় না। পরিবহণ-সমস্যাই শিল্পীদের ছোটো-ছোটো কাজ করতে বাধ্য করেছে। তাই ভাস্করেরা বর্তমানে ছোটো-ছোটো কাজেই মন দিয়েছেন আর হয়তো সেইজন্যই ভাস্কর্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভালোভাবে ফুটে উঠতে পারে নি। তবুও কয়েকটি মূর্তি আমাদের বেশ ভালো লেগেছে। অবশ্য এই কথাও সত্য যে যথার্থ শিল্পকর্ম সর্বদা তার আয়তনের ওপরই সাফল্য নির্ভর করে না, তার বিষয়বস্তুই চিত্র-ভাস্কর্যের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে আসছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক-সম্প্রদায় কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। রাজা-মহারাজাদের স্থান অধিকার করেছেন মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তিরা। এই কলারসিকেরা ইচ্ছা থাকলেও ভালো-ভালো কাজ সংগ্রহ করতে অক্ষম। তার প্রধান কারণ হল সীমিত আর্থিক ক্ষমতা, এবং চিত্র ভাস্কর্য সাজিয়ে রাখবার স্থানের অভাব। আধুনিক ফ্ল্যাটগুলি দিন-দিন ছোটো হয়ে আসছে কিনা। অধুনা নতুন একটি পৃষ্ঠপোষক-গোষ্ঠী দেখা যাচ্ছে। এঁরা হলেন শিল্পকর্মের 'ডীলার'। অল্প মূল্যে চিত্রকর্ম সংগ্রহ করে তাঁরা দেশবিদেশের শিল্পকলার বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রি করেন। ভারতীয় শিল্পের নামে অনেক সময় তাঁরা যে ধরনের কাজকে উৎসাহ দেন তাতে যথার্থ শিল্পসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। আরও দেখা যাচ্ছে যে, বড়ো-বড়ো শিল্পপতিরাও শিল্পপ্রদর্শনীর বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠছেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁদের বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনেরও অনেকটা সুরাহা হয়, এবং সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে ক্রয়বিক্রয়ের বাজারও বিস্তার লাভ করে। যাই হোক, এই দুই গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীদের অবস্থা সচ্ছল হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কেবল এটাই চিন্তার বিষয় যে, শিল্পীরা না আবার বাণিজ্যের মোহে পড়ে নিজস্ব সত্তাকে হারিয়ে ফেলেন। অবশ্য সচেতন শিল্পীদের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা না থাকারই কথা।

কলারসিক

প্রতিবেদন

বিহার বাংলা আকাদেমির স্থাপনা ও পরিকল্পনা

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এবং ঐতিহ্যরক্ষার জন্য ২০ মে ১৯৮৬ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির স্থাপনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ভারতবর্ষে প্রথম সরকারি বাংলা আকাদেমি স্থাপন করা হয়েছে বিহারে। ১২ই মে ১৯৮৩ পাটনায় বাংলা আকাদেমির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, সভাপতিত্ব করেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ড. জগন্নাথ মিশ্র। বিহার বাংলা আকাদেমির প্রথম অধ্যক্ষ প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে (৩০শে মে ৮৩) তিনি আমাকে বলেছিলেন, “বিহারে, বাঙালিদের অনেকেই বেশ কৃতী। সেই কৃতীদের মধ্যে পূর্ণেন্দুবাবু ছিলেন। ভূদেববাবু হিন্দি ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছিলেন। যে কাজগুলো highlighted হয়ে রয়েছে, তাতে কতটা বিহারিদের অবদান আছে তা তুলে ধরতে হবে। এটা একটা research-এর কাজ। এর জন্যে প্রথমে একটা ডিরেক্টরি তৈরি করতে হবে। আমি চাই বিহারিদের একটু prominent করে নিয়ে আসতে। আমরা প্রত্যেক সেন্টারে লোক পাঠিয়ে দেব। সে বিষয়ে বিভিন্ন article নিয়ে একটা বড়ো বই করব। কাজটা আমরা normal wayতেই করব।”

বিভূতিবাবুর মতে, কারুর একক প্রচেষ্টায় নয়, বিহার বাঙালি সমিতির প্রচেষ্টাতেই বাংলা আকাদেমির স্থাপনা সম্ভব হয়েছে।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার : ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বিভিন্ন আকাদেমির স্থাপনা সরকারি প্রচেষ্টার ফলে হয়েছে, কিন্তু বিহার বাংলা আকাদেমি বিহারের বঙ্গভাষীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে এবং পরে সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিহার বাংলা আকাদেমি গঠনের পশ্চাৎপটে রয়েছে বিহার বাঙালি সমিতির ইতিহাস। বিহারের বাঙলাভাষাভাষীদের অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বিহার বাঙালি সমিতি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে divide and rule পলিসির অন্তর্গত নাগরিক অধিকারে বৈষম্যসৃষ্টিকারী ডোমিসাইল রুল প্রত্যাহারের জন্য ১৯৩৮ সালে প্রয়াত পি. আর. দাশের নেতৃত্বে বিহার বাঙালি সমিতি গঠন করা হয়। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, বাঙালি সমিতির প্রচেষ্টাতেই ডোমিসাইল রুল নিষ্ক্রিয় হয় এবং পরবর্তী কালে বে-আইনি বলে ঘোষিত হয়। তিরিশের দশকে বিহার বাঙালি সমিতি বৃহত্তর নাগরিক অধিকারের জন্য যে লড়াই শুরু করেছিল তার অধিকাংশই আজ ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর রক্ষাকবচ, ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপল অব স্টেট পলিসি এবং রাষ্ট্রভাষা ইত্যাদি অধ্যায়ে নানাভাবে বিধিবদ্ধ হয়ে গেছে।

যে-কোনো গণতান্ত্রিক দেশের জনগোষ্ঠীর সংখ্যার গুরুত্ব অনেকখানি। এই সংখ্যার ওপর সেই জনগোষ্ঠীর এবং সুযোগ-সুবিধা ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। বঙ্গভাষীদের বেলায় বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতের সর্বত্রই দেখা গেছে, এমন-কি বিহারেও এর জলন্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বিহারের বাঙলাভাষীদের সংখ্যা নির্ণয়ের সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হয় নি, একথা অবধারিত সত্য। বিহারের বাঙালিদের জনসংখ্যা বাড়ার বদলে কম করিয়ে দেখানোর একটা চেষ্টা চলে আসছে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের বাঙলাভাষীর সংখ্যা ছিল প্রায় বাইশ লক্ষ। ১৯২১ সালে বাঙালির সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় ষোলো লক্ষ এবং ১৯৫১ সালে সতেরো লক্ষ, এবং পঞ্চাশ বছর পরে (১৯১১) ১৯৬১ সালে বাঙালির সংখ্যা বিহারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে হিসেব করলে চৌত্রিশ লক্ষ হবার বদলে সরকারি হিসেবে দেখা গেল মাত্র সাড়ে এগারো লক্ষ। রাজ্য পুনর্গঠনের সময় মানভূম এবং পূর্ণিয়ার সামান্য কিছু অংশ বিহারের থেকে আলাদা হয়েছে যার ফলে কিছু বাঙলাভাষাভাষীর সংখ্যা কমেছে ঠিকই, কিন্তু এতখানি তফাত আদৌ ঠিক নয়। বর্তমানে সরকারি হিসাব অনুযায়ী বাঙালির সংখ্যা উনিশ লক্ষ যা আদৌ ঠিক সংখ্যা নয়, কারণ বেসরকারি মতে বাঙালির সংখ্যা বিহারে তিরিশ লক্ষেরও ওপরে।

বিহারে সেনসাসের কর্তাদের খামখেয়ালিপনা বন্ধ করতে এবং সংখ্যালঘুরা উপেক্ষিত হতে থাকায় ১৯৬৬ সালে বাঙালি সমিতির পুনর্গঠন করা হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বিহারের বাঙালিদের মধ্যে অসহায়তা আর ভীতির ভাব, হতাশা আর নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছিল, বাঙালি সমিতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাঙালির মধ্যে আবার মনোবল বাড়ল, সচেতনতা জন্ম নিল। বিহারের বাঙালি ‘প্রবাসী’ হয়ে থাকতে চাইল না।

১৯৭২ সাল বিহার বাঙালি সমিতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। ২৩শে জানুয়ারি ৭২ সালে পাটনার বৈঠকে সমিতির মুখপত্র হিসাবে একটি বাঙলা পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রাজ্যের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ বাঙালি গ্রামের অধিবাসী। সুতরাং গ্রামবাসীদের এবং শহরবাসীদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং প্রধানত বাঙালি সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ওই বছর পাক্ষিক পত্রিকা ‘সঙ্কিতা’র প্রকাশনা আরম্ভ হয়। পত্রিকা প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যেই (১৯৭২) রাজ্যস্তরে সংখ্যালঘু কমিশনের প্রথম বৈঠক বসে। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিহারবাসী বাঙালিদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে স্মারকলিপি উপস্থাপিত করার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এর আগে ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় বিহার সরকারের শিল্প-সাহিত্য সাহায্যকোষ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। ওই সাহায্যকোষে বিহারের কিছু গোষ্ঠীর ভাষা রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। বাঙলার কোনো উল্লেখ ছিল না। বাঙলা ভাষাকে সাহায্যকোষের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাঙালি সমিতির তিনজন প্রতিনিধি তৎকালীন রাজ্যপাল দেবকান্ত বড়ুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সরকারি মহল থেকে এরকম কথাও নাকি উঠেছিল যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেই বিহারের বাঙালিদের উচিত বাঙলা আকাদেমির দাবি জানানো। আবার একথাও বলা হয়েছিল, বাঙলা ভাষা এত সমৃদ্ধ, তার আকাদেমির কী প্রয়োজন? এইভাবে সরকারি পক্ষ থেকে টালবাহানা চলতে থাকে। যাই হোক তৎকালীন রাজ্যপাল বড়ুয়া প্রতিনিধিদের পরামর্শ দেন যে আগে বিহারে বাঙলা ভাষার রাজনৈতিক গুরুত্ব সরকারকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে।

১৯৭৬ সালে ২৯শে ফেবরুয়ারি সমস্তিপুরে বার্ষিক সম্মেলনে বাংলা আকাদেমি গঠনের প্রস্তাব পাস করানো হয়। ১৯৭৮ ও ৭৯ সালে ভাগলপুর ও রানীবহাল (সাঁওতাল পরগনা) বার্ষিক সম্মেলনে বাংলা আকাদেমির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। সরকারি প্রতিশ্রুতি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৯ সালের সেপটেমবর মাসে ‘বাংলাভাষার সেবক দ্বারা গঠিত’ কমিটি একটি বেসরকারি আকাদেমি গঠন করেছিল।

আকাদেমির অস্থায়ী সভাপতি হন বিশিষ্ট অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার। ১৯৭৯ সালের সেপটেমবর মাসে বিহার বিধানসভায় কমলনাথ সিংহ ঠাকুর নামে জনৈক সদস্য বাংলা আকাদেমি গঠনের দাবি জানিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সেই বছরেই (১৯৭৯) ডিসেমবর মাসে অধ্যাপক হালদারের আকস্মিক মৃত্যু হলে শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে অধ্যক্ষ করা হয়। পরবর্তী কালে বাঙলা আকাদেমির একটি সংবিধান রচনা করা হয় এবং সংবিধানটির চূড়ান্ত রূপ দেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পাটনার সব্যসাচী ডা. শরদিন্দু ঘোষাল ও দীপেন্দ্রনাথ সরকারের মৃত্যুতে বাঙলা আকাদেমির কাজ অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ এঁরা আকাদেমি গঠনের জন্য খুবই চেষ্টা করেছিলেন।

১১ই এপ্রিল ১৯৮২ সালে বাঙালি সমিতির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় পাটনায়। ওই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন রাজ্যশিক্ষামন্ত্রী সমায়লে নবী। তিনি তাঁর ভাষণে দীপেন্দ্রনাথ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বাঙলা আকাদেমি স্থাপনের সরকারি ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। যেহেতু ১৯৮২ সালের বিহারের রাজ্য বাজেটে কোনো খরচ নির্ধারিত হয় নি, তাই তিনি এটিকে ৮৩ সালের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দেন। ইতিপূর্বে বাঙলা আকাদেমির যে সংবিধানটি তৈরি হয়েছিল সরকারি নথিভুক্ত করার ব্যাপারে অসুবিধা হওয়ায় প্রভু মুখোপাধ্যায়, পারিজাতপ্রসূন সেনের সহযোগিতায় চূড়ান্ত রূপ দেন। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২৫তম বিহার রাজ্য বঙ্গভাষী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পূর্ণিয়ায়। তৎকালীন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ড. জগন্নাথ মিশ্র বাংলা আকাদেমি স্থাপনের সরকারি স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন। ১২ই মে ১৯৮৩ সালে পাটনায় বাংলা আকাদেমি স্থাপনের কিছুদিনের মধ্যেই বিহারের মন্ত্রিসভায় রদবদল হয়। নতুন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সিং বাঙলা আকাদেমির কমিটি গঠন করার ভার দেন শিক্ষামন্ত্রীকে। উচ্চশিক্ষার বিশেষ সেক্রেটারিকে ডাইরেকটর করে ফাইল চলাচল করা হয়, এবং তারপর অত্যন্ত দক্ষ সিনিয়র আই. এ.

এস. অফিসার প্রণবশংকর মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী ডাইরেকটর করেন। ঐ বছর ডিসেমবর মাসে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রাঁচী অধিবেশনে তুষারকান্তি ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সিংকে আকাডেমির বোর্ড গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করতে বলেন। তিনি তুষারবাবুর কাছে নামের তালিকা চান। তুষারবাবু বিহারের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে অধ্যক্ষ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পাঠানো নামের তালিকাটিই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠান এবং সেই তালিকাটিই স্বীকৃত হয়।

১২ই ফেবরুয়ারি ১৯৮৪ জামশেদপুরে বাঙালি সমিতির অধিবেশনে বিহারের তৎকালীন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নাগেন্দ্র ঝা ঘোষণা করেন যে বিহার বাঙলা আকাদেমি গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, চলতি বছরে ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিহার সমিতির মুখপত্র "সঞ্চিতা"র ১৫ মার্চ, ১৯৮৪র সংখ্যায় আকাদেমির উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়। বিহারে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি এবং সমৃদ্ধি সাধন করা, ভারতের সংবিধান এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিধিতে উদ্দিষ্ট বাঙলা ভাষা-লিপি-সংস্কৃতি সংরক্ষণ করা, বিহারের বাঙলা উপভাষা ও তার লোকশিল্প ও সংস্কৃতি এবং ভারতের অন্যান্য ভাষা ও উপভাষার দুর্লভ পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান, সম্পাদনা ও প্রকাশ করা, বিহারের স্কুল-কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা শিক্ষা ও বাঙলা মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতিকল্পে কাজ করার জন্য বিহারের বিভিন্ন জেলায় আকাদেমির কিছু স্থায়ী সহযোগী সদস্য মনোনীত করা হয়।

বিহারে প্রচলিত সংস্কৃত, হিন্দি, উরদু, ওড়িয়া, মৈথিলি, মগহি, ভোজপুরি ও আদিবাসী ভাষাসমূহের সঙ্গে তুলনামূলক অধ্যয়ন, দেশ-বিদেশের অন্যান্য বাঙলা আকাদেমি ও ভারতীয় ভাষার আকাদেমির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনের সঙ্গে-সঙ্গে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাহিত্যসংক্রান্ত বক্তৃতা, আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী, বইমেলা, প্রতিযোগিতা, সম্মেলন প্রভৃতির আয়োজন এবং ছাত্রদের সাহায্যার্থে সাধারণ পাঠাগার, বুক-ব্যাঙ্ক-স্থাপন করা, বিহারের যোগ্য বাঙলা কবি-লেখকদের আর্থিক সাহায্য দান করার ব্যাপারেও বাংলা আকাদেমি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে জানানো হয়।

আকাদেমির প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ, ১১-১২ অগস্ট' ১৯৮৪ পাটনায় রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় সংহতি আলোচনাচক্রের আয়োজন। ওই আলোচনাচক্রে ট্যাগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিরেকটর প্রয়াত সোমেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বভারতীর বিদগ্ধ অধ্যাপক ড. ভবতোষ দত্ত ও ড. রামবহাল তেওয়ারী সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাচক্রের নির্দেশক ছিলেন গোপাল হালদার এবং সভাপতিত্ব করেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ওই আলোচনাগুলি নিয়ে এ বৎসর রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে "রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় সংহতি" গ্রন্থ প্রকাশনার প্রস্তুতি চলছে। এ ছাড়া "রবীন্দ্রনাথ ও বিহার" গ্রন্থ প্রকাশের কাজটি অনেকদূর এগিয়ে গেছে। শ্রীঅমল সেনগুপ্তকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ২৫শে অকটোবর ৮৬ পাটনার খুদাবক্স লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে বিহারের বিভিন্ন ভাষার আকাদেমির প্রতিনিধিদের একটি বৈঠকে একে অপরের ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বাঙলা আকাদেমির সহ-নির্দেশক ড. গুরুচরণ সামন্ত বিহারের তিনজন গল্পলেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী এবং বনফুলের গ্রন্থ অনুবাদের প্রস্তাব দেন।

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের উপন্যাস ও ছোটোগল্পের অনুবাদের মধ্যেই বর্তমানে কাজ সীমাবদ্ধ থাকবে বলে জানা গেছে। উরদু আকাদেমি বিভূতিবাবুর কয়েকটি গ্রন্থ উরদুতে অনুবাদ করার কাজ আরম্ভ করেছে। এ ছাড়া বাঙলা থেকে মৈথিলি এবং মৈথিলি থেকে বাঙলা অনুবাদ করার পরিকল্পনাও চলছে।

৪ঠা এপ্রিল ১৯৮৫ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ ড. কাজী আব্দুল মান্নানকে আকাদেমীর পক্ষ থেকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। ড. মান্নান তাঁর সম্পাদিত ও বাঙলা আকাদেমি, ঢাকা প্রকাশিত চারখণ্ড মীর মোশাররফ হোসেন গ্রন্থাবলী বিহার বাঙলা আকাদেমিকে উপহার দিয়ে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেন। অধ্যক্ষ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজনৈতিক কারণে দুই বাঙলার বিচ্ছেদের যে সীমারেখা টানা হয়েছে তা দুই আকাদেমির সাংস্কৃতিক মিলনের জোয়ারে মুছে যাবে।

এ ছাড়া ৬ই জুলাই ১৯৮৫ আকাদেমি ভবনে (বুদ্ধ মার্গ, পাটনা) কানাডার টোরেনটো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ জোসেফ টি. ও. কোনেলের "গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাব ও সম্প্রদায়" সম্বন্ধে বাংলা ও ইংরাজিতে বক্তৃতা এবং ৮ই জানুয়ারি '৮৬ (শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞান ভবন, পাটনা) "রবীন্দ্রকাব্যের ইংরাজি অনুবাদ" আলোচনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আকাদেমি আরও কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিহারের সাম্প্রতিক কবিদের নিয়ে একটি বাঙলা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। কাব্যসংকলনটির জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী করা হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান রয়েছেন সাহিত্যিক গোপাল হালদার।

"বিহারে বাঙালী" নামে গবেষণা-গ্রন্থের কাজেও বেশ অগ্রগতি হয়েছে। বিহারের জীবনযাত্রা ও তার অগ্রগতিতে অতীতে এবং আধুনিক কালে বাঙালিদের ভূমিকার ইতিবৃত্ত সংকলন এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিহারের অনেক বড়ো-বড়ো লেখক যেমন শরৎচন্দ্র, বনফুল, সতীনাথ, কেদারনাথ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছেন।

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যগুলি একটি জীবনীমূলক অভিধান রূপে সংকলিত হবে। তার দুটি ভাগ হবে—একটিতে বাঙালি ব্যক্তিসমূহের ও অন্যটিতে বাঙালিদের প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে তথ্য থাকবে। এই গ্রন্থটির প্রধান সম্পাদক হয়েছেন অধ্যাপক শৈলেশ বসু। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব কিনে নেওয়া হয়েছে এবং কেদারনাথ রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশনার কাজ চলছে। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

শঙ্কর ভট্টাচার্য

যাঁদের গ্রাহক-চাঁদার মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৯৮৬ সালে ডিসেমবর মাসে, তাঁরা অনুগ্রহ করে যথাশীঘ্র নতুন বছরের চাঁদা পাঠালে বাধিত হব।

—কর্মাধ্যক্ষ
